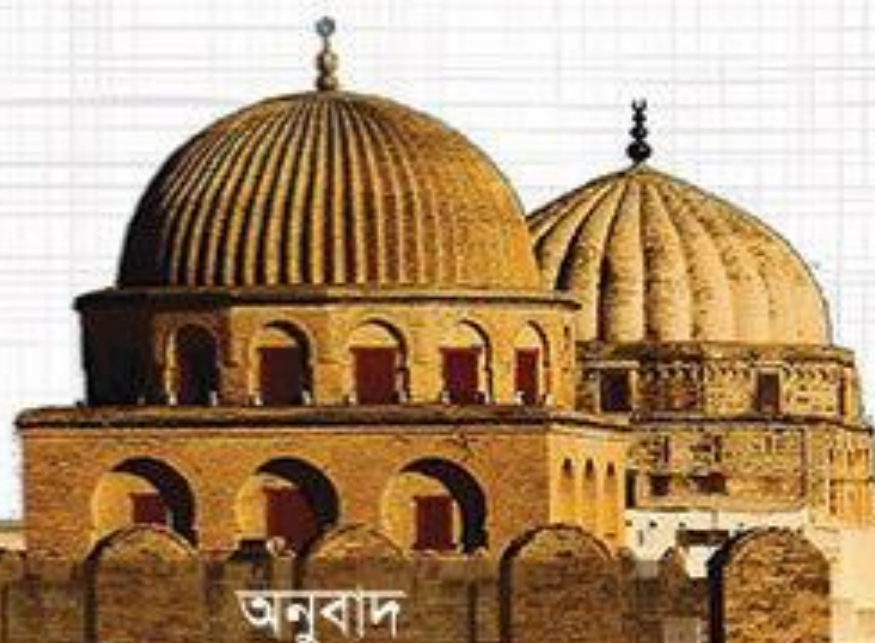




তামিম আনসারী

ডেস্টিনি ডিজরাপ্টেড

ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাস



অনুবাদ

আলী আহমাদ মাবরুর

ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড

মূল : তামিম আনসারী

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর



গাড়িয়ানা

পা ব লি কেশ ন স

প্রকাশকের কথা

একজন পাঠক হিসেবে মুসলমানদের ইতিহাসের বই পড়তে গিয়ে কিছু ব্যাপারে অতৃপ্তি অনুভব করেছি। আমাদের ইতিহাসের বইগুলো তারিখ, সাল, নাম, স্থান-কালসহ বেশ তথ্যে ভরপুর, কিন্তু সেখানে সাহিত্যমানের নিদারুণ অনুপস্থিতি। ইতিহাসের পাঠ কেমন যেন নিরস বর্ণনানির্ভর। পাঠকদের কাছে ইতিহাসের বয়ান মজাদার করে উপস্থাপন করাটা সত্যিকার অর্থেই বড়ো একটা চ্যালেঞ্জ। আমি এমন একটা সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ ইতিহাসের বই খুঁজেছি, যা পড়ে একজন পাঠক পরিতৃপ্ত হবেন, প্রতিটি পৃষ্ঠায় একটা আলাদা আকর্ষণ অনুভব করতে পারবেন। ইতিহাস পড়তে গিয়ে কেউ ক্লান্ত হবে না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ইতিহাসের বইগুলোতে বর্ণনার ধারাবাহিকতার বেশ ছন্দপতন দেখেছি। বইগুলোতে ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরার বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা নেই। আবার এমন কিছু গ্রন্থ আছে, যেখানে অনেক তথ্য ও বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে থাকলেও আকারে অনেক বড়ো কিংবা কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এমন একটি গ্রন্থ খুঁজেছি, যেখানে মুসলমানদের পুরো ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার আছে। মাত্র একটি বইয়েই আমাদের প্রয়োজনীয় ইতিহাস সংকলিত আকারে দেখতে চেয়েছি।

সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে একদিন জিয়া হাসান ভাইয়ের *Destiny Disrupted : A History of the World Through Islamic Eyes* বইয়ের ওপর করা ভিডিও রিভিউ দেখছিলাম। সেখান থেকে উৎসুক হয়ে বইটির পিডিএফ পড়েই পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। এমন একটা বই-ই তো আমি খুঁজছি! জিয়া হাসান ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই, উনি ভিডিও রিভিউ না করলে সম্ভবত দারুণ এই বইটি আমার নজরেই আসত না। আলী আহমাদ মাবরুর ভাইকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মন্ত্রীপুত্র এতটা সাধারণ আর বিনয়ী হতে পারে, মাবরুর ভাইকে না দেখলে তা উপলব্ধি করতে পারতাম না। মাত্র পাঁচ মাসেই এত বড়ো বইটির প্রাঞ্জল অনুবাদ করে দিয়ে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। অনুবাদকের প্রথম অনূদিত বই হলেও পুরো বই জুড়ে পাঠক বেশ প্রাঞ্জলতা পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আলোচিত এই বইটি ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হওয়ার পর তুমুল পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এরই মাঝে একটা বড়ো ভুল দৃষ্টিগোচর হয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলে বইটির সর্বশেষ সম্পাদিত কপির পরিবর্তে অসম্পাদিত কপি ছাপাখানায় চলে যায়। যার কারণে কিছু তথ্যগত বিভ্রাটের সাথে পুরো সতেরো নম্বর অধ্যায়টি বাদ পড়ে যায়। আমরা দীর্ঘ পাঁচ মাসব্যাপী বইটির সম্পাদনা করেছি, তথ্যবিভ্রাট দূর করার চেষ্টা করেছি। এরপরেও কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে

পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। বইটিকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটিমুক্ত করার স্বার্থে সম্পাদনার সময়ক্ষেপণের কারণে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। সম্মানিত পাঠকদের কাছে বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বইটির সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বইটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা সম্মানিত পাঠকদের পজেটিভ-নেগেটিভ ফিডব্যাক পেয়েছি। প্রত্যেকটি ফিডব্যাক আমলে নিয়ে আমরা নতুন করে কাজ করেছি। এতটুকু জানিয়ে রাখা জরুরি মনে করছি যে- লেখক এখানে প্রত্যেকটি চিন্তা-কাঠামোর বক্তব্য ও তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারার স্ব স্ব বয়ান থেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। বইটির মূল ফোকাস- কীভাবে মুসলমানরা ধীরে ধীরে ডেসটিনি থেকে বিচ্যুত হলো। এই বইয়ে ইতিহাসের বয়ানগুলোকে প্রমাণ করার পরিবর্তে গল্পের মতো করে পাঠকদের সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে রেফারেন্স-এর পরিবর্তে প্রচলিত ধারণার কেবলমাত্র বর্ণনা রয়েছে। শুদ্ধ কিংবা ভুল- এসব বয়ান পৃথিবীতে জারি ছিল বলেই মুসলমানরা সামষ্টিকভাবে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রাণসত্তার দাবি থেকে সরে গেছে। যার ফলে বীরের জাতি আজ খুব কঠিন সময়ের মুখোমুখি। মুসলমানরা ঠিক কোন কোন পয়েন্টে এসে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল, তা এখানে আলোচিত হয়েছে। আশা করি, পাঠকবৃন্দ বইটি পড়ার সময় এই কথাগুলো বিবেচনায় রাখবেন।

ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড : ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাস বইটি একটা ছোটো মানের ইতিহাসের এনসাইক্লোপিডিয়া। এতে রাসূল ﷺ-এর হিজরত থেকে শুরু করে ২০০১ সালে আমেরিকায় টুইন টাওয়ার হামলা পর্যন্ত সময়ের এক ধারাবাহিক আলোচনা থাকছে। তামিম আনসারির এই বইটি পড়ে ইসলামের চোখ দিয়ে পুরো দুনিয়াকে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। বইটি পড়ার পর ইতিহাসের খুঁটিনাটি আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে আপনার আগ্রহ জন্মাবে নিশ্চয়।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

বাংলাবাজার, ঢাকা।

অনুবাদের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা অশেষ রহমতে অনেক বড়ো একটি কাজ সম্পন্ন করতে পারলাম। *Destiny Disrupted: A History of the World through Islamic Eyes* বইটি তামিম আনসারির একটি অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থ। মুসলমানদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বইটির মূল উপজীব্য। ২০০৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্বে আলোড়ন তুলে ‘বেস্ট সেলার’ বইয়ের স্বীকৃতি পায়। অনন্য সাধারণ তথ্যসূচি এবং সুনিপুণ ভাষায় লেখা ইতিহাস গাঁথার সুবাদে বইটি দারুণ পাঠকপ্রিয় হয়। বিশাল এই বইটি নিয়ে কাজ করার মতো যোগ্য আমি নই, তথাপি আল্লাহ তায়ালা সাহায্য ও অফুরন্ত নেয়ামত পেয়েছি বলেই কাজটা শেষ করা সম্ভব হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটি সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতে আমার তেমন একটা ধারণা ছিল না। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের ভাইয়ের ব্যক্তিগত পছন্দের বই এটি। একদিন উনি আমাকে গার্ডিয়ান অফিসে ডেকে বললেন অনুবাদের কাজ শুরু করতে। প্রথম দিকে নিমরাজি হয়েই কাজটা ধরেছিলাম। তবে যতদিন গেছে, যতটা আমি এগিয়েছি, বইটিকে যতটা জানার সুযোগ পেয়েছি, ততই যেন বইটির প্রতি আমার ভালোবাসা বেড়েছে। এই কাজটি করার জন্য আমার ওপর আস্থা রাখায় প্রিয় ভাই নূর মোহাম্মাদ এবং গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কোনো রকমের চাপ না দিয়ে; বরং সর্বোচ্চ রকমের বিনয় প্রদর্শন করে যেভাবে আমার মতো মানুষের কাছ থেকে তারা এই বড়ো কাজটি আদায় করে নিলেন, সেইজন্য গার্ডিয়ানের গোটা টিম বড়ো আকারে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এই বইটিকে ইসলামি ইতিহাসের একটা ছোটো মানের এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতে আসারও আগে যেই সভ্যতাগুলো পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেখান থেকে শুরু করে আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলা এবং তার পরবর্তী সময়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধাভিযান (War On Terror) পর্যন্ত গোটা সময়টাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এক ফ্রেমে এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম ‘দ্য মিডল ওয়ার্ল্ড’। লেখক এই অধ্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যকে মধ্য পৃথিবী হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই অধ্যায়ে ইসলামের ছোঁয়া পাওয়ার পূর্ব সময়ের মধ্য পৃথিবীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সুনিপুণভাবে। বিশেষ করে সুমেরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, ক্যালডীয় সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, জরথুষ্ট্র ধর্ম চর্চা ও এর প্রভাব, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, পারথিয়ানদের উত্থান, রোমান সাম্রাজ্য, বাইজানটাইন সাম্রাজ্য এবং সেসব যুগের ধর্মচর্চার ধরন আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম ‘দ্য হিজরা’। এই অধ্যায়ে মানবতার মুক্তিদূত হজরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর আবির্ভাবের ঠিক আগ মুহূর্তে মক্কার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কাঠামো কেমন ছিল, নবিজির জন্ম ও নবুওয়াত লাভ, মক্কার প্রভাবশালী নেতৃত্বের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব, হিজরত, হিজরি সালের শুরু, ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের প্রভাব ও গুরুত্ব, রাসূলের ﷺ মদিনার জীবনের বিভিন্ন যুদ্ধ ও চ্যালেঞ্জসমূহ, ইসলামের সামাজিক ও মানবিক চেতনার বিকাশ, মক্কা বিজয়, বিদায় হজ এবং রাসূলের ﷺ ওফাতের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘খেলাফতের জন্ম’। রাসূলের ﷺ ওফাতের পর খেলাফত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রথম খলিফা নির্বাচন কীভাবে সম্পন্ন হয়, এই প্রক্রিয়ায় কী কী সংকট দেখা দেয়, নতুন খলিফা কীভাবে কাজ করতেন, তার রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিসমূহ, প্রথম খলিফার ইন্তেকাল, দ্বিতীয় খলিফার নিয়োগ, খলিফা হজরত উমরের (রা.) রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা, ইসলামের বিকাশ ও ব্যাপ্তি, দ্বিতীয় খলিফার আমলে সামাজিক ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, সাদাসিধে জীবনযাপন এবং উত্তরাধিকার নির্বাচনে ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গুরা বা পরামর্শ সভা গঠনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম ‘বিভেদ-বিভাজন’। এই অধ্যায়ের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে কেন হজরত উসমান (রা.) তৃতীয় খলিফা হওয়ার জন্য বিবেচিত হলেন। হজরত উসমানের (রা.) নানা মানবিক গুণাবলি, তার খেলাফতের শেষ সময়ে সৃষ্ট সংকট, হজরত উসমানের (রা.) শাহাদাত, চতুর্থ খলিফা হিসেবে হজরত আলির (রা.) নিয়োগ, হজরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হজরত আলির (রা.) মধ্যে সৃষ্ট দূরত্ব, হজরত আয়েশা (রা.)-এর এই ইস্যুতে ভূমিকা, উটের যুদ্ধের দুঃখজনক ইতিহাস, খেলাফতের মধ্যে প্রথম বিভাজন এবং হজরত আলির (রা.) শাহাদাত পর্যন্ত ঘটনাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম ‘উমাইয়া যুগ’। এই অধ্যায়ে কারবালায় ইমাম হুসাইন (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাত, শহিদি চেতনার উদ্ভব, ইয়াজিদের শাসন, খেলাফতের উত্তরাধিকার বিতর্ক, শিয়া জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি ও বিকাশ, উমাইয়া যুগের সূচনা এবং সাম্রাজ্যের বিকাশ, উমাইয়া শাসকদের বিলাসিতা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন, আরবি ভাষার ব্যাপকভিত্তিক প্রচলনের ইতিহাস প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম ‘আব্বাসি যুগ’। এই অধ্যায়ে উমাইয়া যুগে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য, মানুষের অসন্তোষ, একই উম্মতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ, খারিজিদের ইতিহাস, আবু আব্বাসের মাধ্যমে রাসূলের ﷺ বংশের হাতে নেতৃত্বকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা, উমাইয়াদের পতন, বাগদাদে মুসলমান সভ্যতার নতুন প্রাণকেন্দ্র স্থাপন, জ্ঞানচর্চার প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘জ্ঞানী, দার্শনিক ও সুফি সাধকদের যুগ।’ কীভাবে ইসলামি দুনিয়ায় দার্শনিক চিন্তা-ভাবনাগুলো এগিয়ে গেল, রাসূল ﷺ-এর অনুপস্থিতিতে কুরআনের কোনো আয়াতের বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন হলে কীভাবে তার সুরাহা হবে, হাদিসের উৎপত্তি ও সংরক্ষণ, হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাই প্রক্রিয়া, ইসলামি শরিয়তের উৎস হিসেবে ইজমা ও কিয়াসের ব্যবহার, মাজহাব সৃষ্টি, শিয়া ও সুন্নিদের চিন্তা-কাঠামোর পার্থক্যসমূহ, গ্রিক ও অন্যান্য দার্শনিকদের সাথে ইসলামি দার্শনিকদের পার্থক্য, আব্বাসি যুগের মুসলিম মনীষী ও দার্শনিকদের কাজের ধরন, সুন্নিদের চার মাজহাবের চার ইমাম নিয়ে আলোচনা, সুফিবাদের উত্থানের কারণ ও ইতিহাস, রাবেয়া বসরি ও ইমাম গাজালির আবির্ভাব, দর্শনশাস্ত্রে ইমাম গাজালির অবদান প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘তুর্কিদের আবির্ভাব ও উত্থান’। এই অধ্যায়ে আগের অধ্যায়ের ধারাবাহিকতায় বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের বিকাশ, উমাইয়া বংশের জীবিত প্রতিনিধির হাত দিয়ে আবারও উমাইয়া শাসনের প্রতিষ্ঠা, মিসরে ফাতেমিদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা, ইসলামি সাম্রাজ্যে একাধিক খেলাফতের কার্যক্রম, বিভিন্ন খেলাফতের শাসকদের কাজের ধরনের ভিন্নতা, আন্দালুসিয়ার ইতিহাস, মামলুক শ্রেণির উত্থান, সুলতান মাহমুদ গজনভির বিজয়াভিযান, মহাকবি ফেরদৌসি ও শাহনামা, সেলজুকদের আবির্ভাব ও উত্থান, নিজাম-উল-মুলকের আমল, তার কাজের ধরন ও উন্নয়নের চিত্র, হাসান সাবাহ এবং তার আততায়ী গ্রুপের আবির্ভাব ও গুপ্তহত্যার প্রচলন, শিয়াদের ৫ম ও ৭ম ইমাম নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি ইস্যু আলোচিত হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের নাম ‘ব্যাপক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য’। এই অধ্যায়ে অনগ্রসর অবস্থান থেকে ইউরোপীয়দের ধারাবাহিক উন্নয়ন, ফিলিস্তিন সংকটের সূচনা ইতিহাস, পোপ আরবানের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঘোষণা, মুসলমানদের কিছু রাজ্য দখল হয়ে যাওয়া, জেরুজালেম দখল এবং খ্রিষ্টান বাহিনীর পৈশাচিকতা, নুরুদ্দিন জঙ্গির আবির্ভাব, সালাহউদ্দিন আইউবির জেরুজালেম বিজয়, ভেতরে ভেতরে অ্যাসাসিন বা আততায়ী গ্রুপের কার্যক্রম চলমান থাকা, খ্রিষ্টানদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেডের ব্যর্থতা, মোঙ্গল হলোকাস্ট, চেঙ্গিজ খানের বাগদাদ দখল এবং অমানবিক বর্বরতা, মোঙ্গল নেতা হালাকুর বর্বরতা, অ্যাসাসিন গ্রুপের বিনাশ এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ের নাম ‘পুনরুত্থান’। তৈমুর লং-এর আত্মসন, ইবনে তাইমিয়ার আগমন এবং ইসলামের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে অবদান, সুফিবাদের ক্রমাগত বিকাশের মধ্য দিয়ে অসংখ্য শায়খের আবির্ভাব, অন্য ধর্মের সন্ন্যাসতন্ত্রের সাথে ইসলামি সুফিবাদের পার্থক্য, জালাল উদ্দিন রুমি ও শামস-ই-তাবরিজির কর্মকাণ্ড, অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, প্রথম বায়জিদের শাসনকাল, সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ’র ঐতিহাসিক কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়, অটোম্যান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সহাবস্থান, অটোম্যান সাম্রাজ্যের জটিল শাসন পদ্ধতি, অটোম্যানদের দেহশ্রিম প্রকল্প,

সুলতান সুলেমানের অবদান, সাফাভীয় গোষ্ঠীর উত্থান, শিয়াদের গুপ্ত তথা ১২নং ইমামের ইস্যু, ঐতিহাসিক চালদিরান যুদ্ধ এবং এর প্রভাব, পারস্য সাম্রাজ্যে শিল্পকলার প্রভাব এবং অসাধারণ স্থাপত্য শিল্প, জহিরউদ্দিন বাবরের মাধ্যমে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, মোঘলদের ২০০ বছরের সফল শাসন, সম্রাট আকবর এবং তার দ্বীন-ই-ইলাহি, সম্রাট শাহজাহান এবং তাঁর তাজমহল, সম্রাট আওরঙ্গজেব এবং তাঁর সফল রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসসহ বিভিন্ন ইস্যু এই বিশাল অধ্যায়টিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের নাম ‘ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা’। এই অধ্যায়ে পাঠকদের দৃষ্টি নেওয়া হয়েছে তৎকালীন ইউরোপের দিকে। মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতি ইউরোপীয়দের তীব্র লোভ, ভাইকিংস তথা নৌ অভিযাত্রীদের অভিযান, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজা-রানিরা যেভাবে সমুদ্র অভিযানকে স্পর্শ করতেন, ইতালীয়দের প্রাথমিক সাফল্য, শিক্ষিত মুসলমানদের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের শিক্ষিত হয়ে ওঠা, খ্রিষ্টান চার্চগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রোটেষ্ট্যান্টদের উত্থান ও বিকাশ, মুসলমানদের বহু বছর পর অনেক কিছু আবিষ্কার করেও কেন খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের থেকে এগিয়ে গেল, জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভব, ইউরোপীয়দের মুদ্রা ও বাণিজ্যকৌশল প্রভৃতি বিষয় এই অধ্যায়ের আলোচনায় ঠাঁই পেয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ‘পাশ্চাত্যের প্রাচ্যমুখী অভিযান’। রাজনীতিবিদ বা যোদ্ধা নয়, বরং ব্যবসায়ী হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে ইউরোপীয়দের আগমন, ভাস্কো-দা-গামার ভারত অভিযান, ভারতের গোয়া নগরীর সৃষ্টি ইতিহাস, অটোম্যানদের লেপান্তো যুদ্ধে পরাজয়, সুলতান সুলেমানের ভিয়েনা বিজয় না করার কারণ পরিণতি, কেন অটোম্যানরা সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল, অটোম্যান অর্থনীতি ও প্রশাসন কীভাবে ইউরোপীয়দের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, অটোম্যান সুলতানদের প্রাসাদে ও সমাজে নারীদের অবস্থান, সাফাভীয় নামক শিয়া রাষ্ট্র যেভাবে সংকটে পড়ল, মোঘল শাসকদের সংকট, ব্রিটিশদের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশদের উপমহাদেশ শাসনের কৌশল, ইউরোপে ব্রিটিশ ও রাশিয়ার মধ্যকার গ্রেট গেম, উপমহাদেশের সিপাহী বিপ্লব, অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ইতিহাস, মিসরে মুহাম্মাদ আলির শাসনকাল এবং মিসর ও আলজেরিয়ার সম্পদগুলোর ফায়দা কীভাবে ইউরোপীয়রা ভোগ করল এই বিষয়গুলো এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শিরোনাম ‘সংস্কার আন্দোলন’। এই অধ্যায়ে মুসলমান সমাজে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কীভাবে সৃষ্টি হলো, খ্রিষ্টানদের প্রোটেষ্ট্যান্ট আন্দোলনের সাথে মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলনের পার্থক্য, ওয়াহাবি আন্দোলনের জন্ম ও বিস্তৃতি, সৌদি আরবের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ওয়াহাবিদের সম্পর্কের সূচনা ইতিহাস, স্যার সৈয়দ আহমদের আলিগড় আন্দোলন, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, জামাল উদ্দিন আফগানির ইসলামি আধুনিকতা তত্ত্বের সূচনার ও বিস্তৃতি, তাঁর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ ও কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়টি হলো ‘শিল্প, সংবিধানতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ’। মুসলমান সাম্রাজ্যের ওপর ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের প্রভাব, ইউরোপীয় মডেলে বিভিন্ন মুসলিম দেশে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালুর ইতিহাস, দেশে দেশে সংবিধান তৈরির হিড়িক, জাতীয়তাবাদের প্রভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভাঙন, আমেরিকা রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস, ইহুদিবাদের উত্থান, ফিলিস্তিনের মুসলমান ভূখণ্ডকে ইহুদিদের কবজা করে নেওয়ার ইতিহাস, ইউরোপীয়দেরকে অটোম্যানদের একের পর এক ছাড় দেওয়ার ঘটনা, আর্মেনিয়ানদের গণহত্যা, তুরস্কে কীভাবে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের চিন্তা খেলাফতের ধারণার বাইরে একটি তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরি করল, ব্রিটিশদের পাল্লায় পড়ে মক্কার নেতা শরিফ হোসাইন যেভাবে অটোম্যান সালাতানাতে সাথে বেঈমানি করল- এসবই পাওয়া যাবে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের নাম ‘ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকপন্থীদের উত্থান’। এখানে মুসলিম খেলাফতের আনুষ্ঠানিক পতন, তুরস্কে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের ইতিহাস, তার হাত দিয়ে একের পর এক ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামবিদ্বেষী পদক্ষেপ গ্রহণ, মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুশীলনের জোয়ার, দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা, আফগানিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, হাসান আল বান্না কর্তৃক ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠা, লিগ অব নেশনস-এর প্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হওয়ার ইতিহাস, মুসলমান দেশগুলোর তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ যেভাবে পশ্চিমারা নিয়ে নিলো, সুয়েজ খালের কর যেভাবে ইউরোপীয়রা ভোগ করল, এ সবগুলো বিষয়ই এই অধ্যায়ে আলোচনায় এসেছে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়ের শিরোনাম ‘আধুনিকতার সংকট’। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মুসলমান দেশগুলোর ওপর এই যুদ্ধের প্রভাব, দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত, ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম, ইজরাইল নামক ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, মিসরে জামাল আব্দুল নাসের এবং আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান, ইখওয়ান এবং সাইয়েদ কুতুবের ওপর নাসের সরকারের দমন-পীড়ন প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে।

সপ্তদশ তথা সর্বশেষ অধ্যায়ের নাম ‘শ্রোতের বিপরীতমুখে যাত্রা’। এই অধ্যায়ে ইতিহাসের নতুন খেলোয়াড় হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব, জামাল আব্দুল নাসেরের পতন, দেশে দেশে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের সাথে শাসকপক্ষের সংঘাত, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সাথে ওয়াহাবিদের বিবাদ, পিএলও ও বাথ পার্টির জন্ম, ইরানে শাহ-এর পতন, শীতল যুদ্ধের কৌশল, তেল রাজনীতির প্রভাব, তেলরাষ্ট্রগুলোর শাসকদের বিলাসিতা, সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি, ইরানে ইমাম খোমেনির বিপ্লব, ধর্মনিরপেক্ষ শাসকমহলের পতন, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, রাশিয়ার আফগান দখলের চেষ্টা, সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত দখল এবং সর্বশেষ আমেরিকার টুইনটাওয়ারে হামলায় এসে ইতিহাসের বিবরণী আপাতত সমাপ্ত হয়েছে।

বইটি সংক্রান্ত আলোচনার পর এবার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পালা। আমি এই বইটি লেখার ব্যাপারে আমার অন্তরের কাছের মানুষদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি। তাদের উৎসাহ না পেলে হয়তো এত বড়ো কাজটা করার মতো সাহস বা ধৈর্য আমার হতো না। বিশেষ করে বলতে হয় আমার স্ত্রী ফারজানা জেরিন এবং আমাদের একমাত্র ছেলে জুহাইর মিহরানের কথা।

বইটি অনুবাদের কাজ আমি পাঁচ মাসে সম্পন্ন করেছি। বইটির সাইজ দেখলে যে কেউ বুঝবেন এই অল্প সময়ে এত বড়ো বই অনুবাদ করা সহজ নয়। তবে আমি এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। কারণ, আমার স্ত্রী আমাকে নিরন্তর সমর্থন দিয়ে গেছেন। এই পাঁচ মাসে সবচেয়ে বেশি আমি বঞ্চিত করেছি আমার স্ত্রী ও সন্তানকে। আশা করি, বইটি হাতে পেলে তারাও সন্তুষ্ট হবেন।

আমার এই কাজটি দেখে সবচেয়ে খুশি হতেন আমার পিতা। তার কথা খুব মনে পড়ছে এখন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে চাইতেন আমি লেখালেখি করি। তারই পরামর্শে আমি একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে চাকরিতে যোগদান করি। পরবর্তী সময়ে আমার সাংবাদিকতার প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা। আমার কোনো লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তার উচ্ছ্বাস আমার চোখে এখনও ভাসে। তার জীবনের সর্বশেষ ব্যক্তিগত প্রকল্প ছিল একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা চালু করা। সেই কাজেও তিনি আমাকে সবসময় তার পাশে রেখেছেন। স্বপ্ন দেখতেন সেই কাজটি আমি টেনে নিয়ে যাব। জানি না কতটুকু কী পারব। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন সৎ থাকতে, বলিষ্ঠ থাকতে, ভীতু মানসিকতা নিয়ে না বাঁচতে, অন্যায়ের সাথে আপস না করতে, সর্বোপরি ভালো ও মন্দ সকল অবস্থায় আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস রাখতে। আমার এই ‘আমি’ হয়ে উঠার পেছনে তার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি- এটা আমি অনুভব করি প্রতি মুহূর্তে।

আমার আত্মা, আমার দেখা একজন সরল মানুষ। আমার সকল ভালো কাজে উৎসাহ দেন সবসময়। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমার ভাই-বোন, পরিবার, আমার স্বশ্রু, শাশুড়ি, আমার নানিসহ জীবিত সকল মুরাব্বি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৩ সাল থেকে বেকার। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সেইসব শুভাকাজক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি যারা এই কয়েক বছর আমাকে অনিয়মিত ধরনের ছোটোখাটো কাজ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে সহযোগিতা করেছেন। হয়তো বেকারত্বের এই দুঃসহ অভিজ্ঞতাটি না হলে আমার কখনো লেখালেখি বা অনুবাদের জগতে আসাই হতো না। আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত এই ফায়সালা আমি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একমাত্র রিজিকদাতা- যিনি আমার পাঁচ বছরের বেকার জীবনে একটি বেলাও আমাকে, আমার পরিবারকে না খাইয়ে রাখেননি।

এটা আমার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। মূল বইয়ের সমস্যা ও ত্রুটি থাকলে আমার পক্ষে সমাধান দেওয়া কঠিন। যদি পাঠকের চোখে অনুবাদসংক্রান্ত কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে সেটা একান্তই আমার ব্যর্থতা। আমি সেই দায় নিতেও রাজি আছি। আমি জানতাম পাঠকবৃন্দ সহজ-সরল ভাষায় লেখনী আশা করেন। আমি চেষ্টা করেছি। তবে ইতিহাসের বিবরণ চাইলেও খুব সহজ করার সুযোগটা কম। আমার ভালো লাগবে, পাঠকবৃন্দ যদি তাদের পরামর্শ বা কোনো সংশোধনীর ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশ্যই সেগুলো আমরা পরবর্তী সময়ে সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বলতে চাই, কাজটা আমার; কিন্তু যেই বইটি প্রকাশিত হচ্ছে তা পাঠকবৃন্দের। এই বইটি পাঠকবৃন্দকে, বিশেষ করে যারা ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে, চিন্তা করতে পছন্দ করেন— এমন মানুষদের জন্য বিরাট একটি তথ্যের ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে। এই বইয়ের পাতায় পাতায় যেই তথ্য আছে, সেগুলো দিয়েই নতুন করে আরও বই লেখা যাবে, অসংখ্য বক্তৃতা দেওয়া যাবে, রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এই বইটি আমাদের পাঠকদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে, এটা আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি। সেই মানসিকতা নিয়েই বইটি লেখা। আল্লাহ যেন আমাদের সকলের সম্মিলিত এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমিন।

আলী আহমাদ মাবরুর

৬ জানুয়ারি, ২০১৮

amabrur@yahoo.com

ভূমিকা

আমার জীবনের বড়ো একটি অংশ কেটেছে আফগানিস্তানে, যেখানে অধিকাংশ মানুষই মুসলমান। তাই ইউরোপ বা আমেরিকার মানুষ ইতিহাসকে যেভাবে চেনে, সেখান থেকে আমি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ইতিহাসকে জানার ও বোঝার সুযোগ পেয়েছি। যদিও আফগানিস্তানের সেই স্মৃতিগুলো আসলে আমার জীবনের একেবারের গোড়ার দিকের কথা। তখন আমার নিজের ভাবনাগুলোই খুব একটা পূর্ণতা পায়নি। সেই সময়গুলোতে আমি ইতিহাস পড়তাম মূলত আনন্দ পাওয়ার জন্যই। আফগানিস্তানে তখন স্থানীয়ভাবে ফার্সি ভাষার প্রচলন ছিল বেশি। আর ফার্সি ভাষায় কিছু নির্দিষ্ট পাঠ্যবই ছাড়া তেমন কোনো মানসম্মত ইতিহাসের বই পাওয়াও যেত না। তখনো পর্যন্ত আমি ভালো বই বলতে যা পড়েছি, সেগুলো আসলে ইংরেজিতে লেখা।

ছোটবেলায় আমি ইতিহাসের ওপর যেসব বই পড়েছিলাম, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় বই ছিল ভি ভি হিলয়ারের লেখা 'A Child's History of the World'। তবে বড়ো হয়ে যখন বইটি আমি পুনরায় পড়তে শুরু করি; তখন আর তেমন ভালো লাগেনি। আমার চিন্তাগুলো তখন আগের তুলনায় বেশ পরিণত হওয়ায় বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলাম, ছোটবেলার ইতিহাসের সেই প্রিয় বইটি আসলে ইউরোপীয় মানসিকতায় লেখা। বইটির পাতায় পাতায় বর্ণবাদের কুৎসিত প্রভাবও আমি তখন অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। ছোটবেলায় বইটি পড়ার সময় এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারিনি। আমার চিন্তা তখন খুব একটা পরিপক্ব ছিল না। তা ছাড়া হিলয়ারের গল্প বলার ধরনটাও ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয়; যা আমাকে খুব অল্পতেই আকর্ষণ করেছিল।

তখন আমার বয়স নয় কি দশ। ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি আমাদের ছোট গ্রামটিতে এসেছিলেন। গ্রামের নাম ছিল লস্করগাঁও। সম্ভবত গ্রামেরই কেউ তখন তাঁকে আমার কথা বলেছিল। কেউ হয়তো বলেছিল, এই গ্রামে একটি ছোট ছেলে আছে, যার ইতিহাস নিয়ে বেশ আগ্রহ আছে। এই কথা শুনে টয়েনবি আমাকে তাঁর সাথে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি সানন্দে আমন্ত্রণ কবুল করে তার কাছে গিয়েছিলাম এবং মুগ্ধ নয়নে ব্রিটিশ সেই বৃদ্ধের সাথে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম। তিনি আমাকে ছোটোখাটো কিছু প্রশ্ন করছিলেন, আর আমিও দিব্যি আমার মতো করে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাঁর একটি অভ্যাসের কথা এখনও আমার মনে পড়ে। তিনি কথা বলার সময় রুমাল কাঁধের ওপর রেখে বসতেন।

বিদায় বেলায় টয়েনবি আমাকে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। বইটি হেনদ্রিক উইলেম ভ্যান লুনের লেখা *The Story of Mankind*। বইটির নামই আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছিল। যেহেতু বইটির নাম ছিল *ম্যানকাইন্ড* (মানুষ বা মানবতা), তাই আমি ধরেই নিয়েছিলাম বইটিতে

নিশ্চয় আমার মতো অনেক মানুষের ইতিহাস থাকবে। হয়তো আমি নিজেকে বইয়ের মাঝে কোনো না কোনোভাবে খুঁজে পাব। আমি গোত্রাসে বইটি গিলছিলাম। বইটি যে শুধু পড়তে ভালো লেগেছিল এমন নয়; বরং ইতিহাসের গল্পকে পশ্চিমা ঢংয়ে বর্ণনা করার কৌশলটাও বেশ ভালো লেগেছিল। পশ্চিমা আদলে ইতিহাসকে বর্ণনা করার ব্যাপারটা সেখান থেকেই আমার ভেতরে গেঁথে যায়।

এরপর থেকে আমি ইতিহাসের যত বই পড়েছি, তার সবই আসলে এই কাঠামোর নতুন নির্যাস মাত্র। আমি ফার্সি ভাষায় লেখা ইতিহাসের পাঠ্যবইও পড়েছি। তবে তা ছিল শুধুই পরীক্ষায় পাস করার জন্য। এগুলো স্রেফ একাডেমিক কারণে পড়তাম। পরীক্ষার পরে আবার ভুলে যেতাম।

সেই ভালো লাগার ঢংয়ের বাইরে গিয়ে অন্য কোনোভাবে ইতিহাসের বর্ণনা আমাকে টানত না। নিজের পছন্দের বাইরের অন্য ধরনের ইতিহাসের বই আমার ওপর খুব একটা কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারেনি। এজন্য জীবনের পরবর্তী সময়ে আমাকে বেশকিছু ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। এমন একটি অভিজ্ঞতা এখানে শেয়ার করাটা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করছি।

টয়েনবির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ৪০ বছর পরে ২০০০ সালের কথা। তখন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সট বুক এডিটর হিসেবে পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনার কাজ করতাম। তখন আবার সেই পুরাতন ইতিহাস অধ্যয়নের প্রভাব আমার ভেতর নতুন করে জেগে উঠেছিল। টেক্সাসের একজন প্রকাশক সেই সময়ে আমাকে স্কুলের জন্য বিশ্ব ইতিহাসের নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তার প্রত্যাশা ছিল আমি একেবারে মানব ইতিহাসের সূচনা থেকেই ইতিহাস বর্ণনা শুরু করব। প্রাথমিকভাবে আমার কাজ ছিল একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করা, যার ওপর ভিত্তি করে গোটা মানব ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া সম্ভব। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য ওই প্রকাশক আমাকে বইটি ১০টি ভাগে ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছিল, যার প্রতিটি ভাগে তিনটি করে অধ্যায় থাকবে।

কিন্তু মানব ইতিহাসের গোটা সময়টাকে কি আদৌ ১০ ভাগে বর্ণনা করা সম্ভব? বিশ্ব ইতিহাস মানে কেবল আজ অবধি ঘটে যাওয়া সকল ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণই নয়; একইসঙ্গে সেসব ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা, যেগুলো আসলে ইতিহাসের টার্নিং পয়েন্টের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত।

আমি বেশ উৎসাহ নিয়েই কাজে নেমে পড়েছিলাম। তবে আমার যেকোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কয়েকজন উপদেষ্টা, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, ইতিহাসের শিক্ষক, বিপণন কর্মকর্তা, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কর্মকর্তা, পেশাদার বুদ্ধিজীবীর অনুমোদনের দরকার হতো। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শ্রেণির বই রচনার ক্ষেত্রে এই বাছাই ও অনুমোদনের প্রক্রিয়াকে আমার কাছে বেশ স্বাভাবিকই মনে হয়। কারণ, এই বইগুলো আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বইগুলোর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এমন ইতিহাস পৌঁছে দেওয়া হয়, যেগুলোর ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই। তাই বইগুলোর প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের ঐকমত্যে আসাটা জরুরি ছিল।

কাজটা নিয়ে আরও কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর লক্ষ করলাম নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে আমার দ্বিমত হচ্ছে। আমরা ইতিহাসের অনেক বিষয়েই একমত হতাম; কেবল একটি বিষয় ছাড়া। সেই বিষয়টি হলো ‘ইসলাম’। আমি সবসময়ই চাইতাম, বিশ্ব ইতিহাসের মধ্যে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাবলিকে বেশি ফোকাস করতে। আর তারা চাইত, ইসলামি বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য কোনো ঘটনাবলি নিয়ে কাজ করতে। আমরা তখন যারা একসঙ্গে কাজ করেছি, তাদের কেউই আসলে নিজেদের স্বজাতীয় ইতিহাস ও সভ্যতাকে নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতাম না। এমন না আমি ইসলামকে পশ্চিমাদের ইতিহাস থেকে বড়ো করে দেখাতে চাইতাম, বিপরীতে তারা ইসলামকে ছোটো করে দেখাত। ব্যবধান বা দ্বিমতের জায়গাটি ছিল আসলে আমাদের মানসিকতায় ও চেতনায়। যেহেতু আমরা সবাই বিশ্ব ইতিহাস রচনার কাজে নিয়োজিত ছিলাম, তাই আমরা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করতাম, যার যার পছন্দের আদর্শ মানব ইতিহাসের সাথে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে জড়িত।

আমি মুসলমান হওয়ায় সেখানে ছিলাম সংখ্যালঘু। তাই আমি যা বলতাম, সেটা শেষ পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হিসেবেই প্রমাণিত হতো। সে কারণেই শেষ পর্যন্ত আমরা যে পাঠ্যসূচিটি দাঁড় করাতে সক্ষম ছিলাম, সেখানে অন্য বিশেষজ্ঞদের চিন্তাই বেশি প্রতিফলিত হলো। দেখা গেল বইটিতে যে ৩০টি অধ্যায় রয়েছে, তার মাত্র দুটোতে ইসলাম মুখ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। দুটো অধ্যায়ের নাম ছিল ‘Pre-Columbian Civilization of the Americas’ এবং ‘Ancient Empires of Africa’।

যদিও সে সময়ের আলোকে ইসলামের এতটুকু কভারেজ পাওয়াও ছিল বিরাট ব্যাপার। এর আগে ট্রেজাসের স্কুলগুলোতে বিশ্ব ইতিহাসের ওপর যে বইটি ছিল, সেটা ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মানে আমার কাজটার তিন বছর আগে। বইটির নাম *Perspective on the past*। যেখানে ৩৭টি অধ্যায়ের মধ্যে ইসলাম আলোচিত হয়েছিল মাত্র একটি অধ্যায়ে; তাও পুরো অধ্যায় জুড়ে ইসলাম ছিল না। অর্ধেক ছিল ইসলাম সম্পর্কিত আর বাকি অর্ধেক ছিল মধ্যযুগ সম্পর্কিত।

সেপ্টেম্বর ২০০১-এর বছর খানেক আগে সেই বইটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে বুঝতে পারলাম, তাদের কাছে ইসলাম খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। যার আবেদন রেনেসাঁস বা শিল্প বিপ্লবের বছর আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাদের প্রকাশিত বইটির তথ্যসূচি দেখলে আপনার মনেই হবে না যে, পৃথিবীতে ইসলাম বলতে আদৌ কিছু অবশিষ্ট আছে।

একটা পর্যায়ে মানসিকভাবে ধরে নিলাম আমার ইতিহাসের ধারণায় কিছুটা ঘাটতি আছে। ঘাটতি থাকা খুব অস্বাভাবিকও নয়। একেবারে ব্যক্তিগত সত্তা তথা পরিচয়ের জায়গা থেকেই ইসলামের সাথে আমি সম্পৃক্ত। তাই ইসলামের প্রতি একটু বাড়তি আনুকূল্য থাকায়, সার্বিক ইতিহাস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমি নিরপেক্ষ থাকতে পারি না।

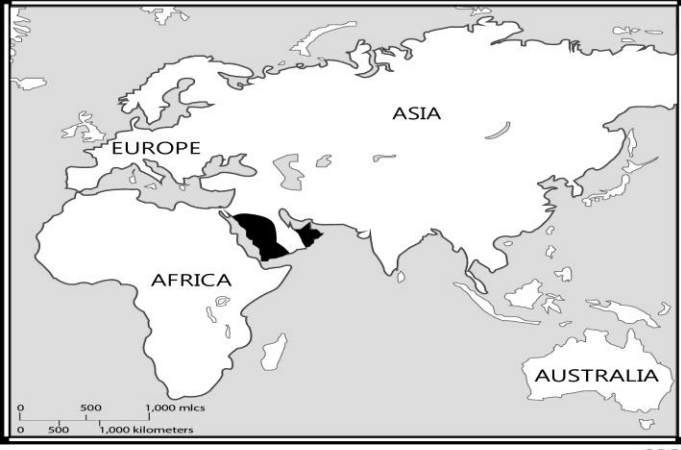
আমি একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে জন্ম নিয়েছি বলেই ইসলামের প্রতি আমার এই টান, বিষয়টা এমন ছিল না। পারিবারিকভাবেও বিষয়টার আলাদা কিছু তাৎপর্য আছে। আফগানিস্তানে আমার পরিবারের একটু আলাদা সম্মান আছে। এই সম্মানের মূল কারণ, ধর্ম সম্পর্কে আমাদের পরিবারের পূর্বসূরিদের অগাধ জানাশোনা। আমার নামের শেষাংশ হলো ‘আনসারি’। এই শব্দটি এসেছে ‘আনসার’ থেকে। এই আনসার হলো মদিনার সেই আনসার, মক্কার কাফির-মুশরিকদের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের কঠিন সময়ে যারা প্রিয়নবি ﷺ-কে মদিনায় আবাসন গড়তে সাহায্য করেছিলেন। আনসারদের সেই সহযোগিতার মাধ্যমেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

আমার দাদার প্রপিতামহ ছিলেন একজন মুসলিম দরবেশ। তাঁর ওফাতের পর সেখানে একটি দরগা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে শুরু করে আজ অবধি অসংখ্য মানুষ ভিড় করে সেখানে। তবে আমার পূর্বসূরিদের সেই কর্মধারা আমার পিতার সময় থেকে কমতে শুরু করে। আর আমার বেলায় এসে তা একেবারেই স্তান হয়ে যায়। বড়ো হতে হতে আমি আমার নিজস্ব পরিমণ্ডলের মুসলমানদের যেসব গল্প, কল্প-কাহিনি ও নিরীক্ষা শুনতে পেলাম, তা আমার মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে এবং একটা পর্যায়ে আমি মানসিকভাবে অনেকটা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যাই।

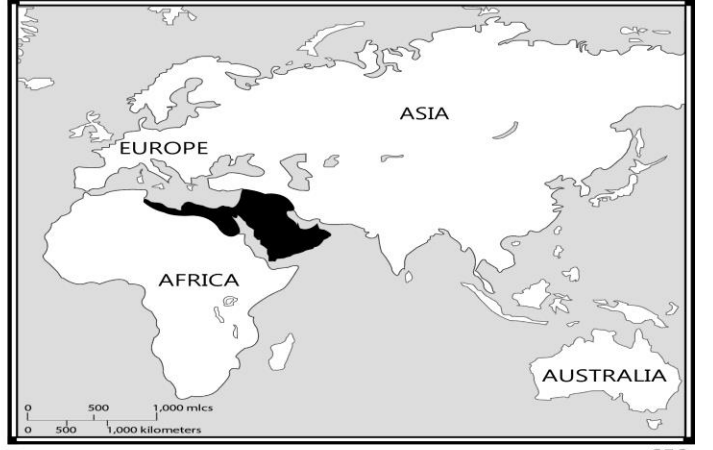
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার পরও আমার ভেতরের এই ধর্মনিরপেক্ষতা বিদ্যমান থাকে। তবে মজার ব্যাপার হলো, মুসলিম দেশ আফগানিস্তানে থাকার পরেও আমার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ যতটা না ছিল, আমেরিকায় আসার পর তা অনেকটা বেড়ে যায়। বিশেষ করে ১৯৭৯ সালের পর ইসলাম সম্পর্কে আমি গভীরভাবে জানার তাগিদ অনুভব করি। কারণ, সে বছরই আমার এক ভাই তথাকথিত চরমপন্থার (পশ্চিমাদের তৈরি করা টার্ম ফান্ডামেন্টালিস্ট) সাথে যুক্ত হয়। আমি বিভিন্ন মুসলিম পণ্ডিত ও দার্শনিকের লেখনীর মাধ্যমে ইসলামকে বুঝতে শুরু করি।

বিশেষ করে ফজলুর রহমান এবং সাইয়েদ হুসাইন নাসরের বই ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন শুরু করি। একইসঙ্গে আমি আর্নেস্ট গ্রনবাম এবং আলবার্ট হোরানির মতো ইতিহাসবেত্তাদের বইও পড়া আরম্ভ করি। সেই সময়ের ব্যাপক পড়াশোনার কারণ ছিল আমার সেই ভাই। আমি আসলে জানতে চেয়েছিলাম, আমি বা আমার ভাইয়ের অতীত ইতিহাসটি আসলে কী? আমরা কোথা থেকে আজকের এই অবস্থানে এসে পৌঁছলাম?

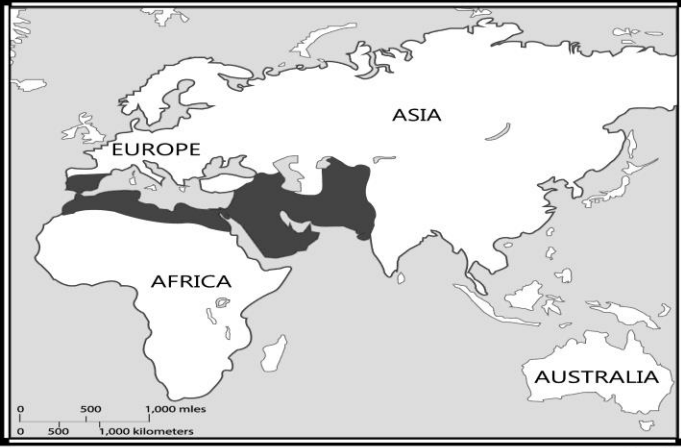
আমার এই মানসিকতায় ও বক্তব্যে কারও মনে হতে পারে, আমি হয়তো ইসলাম নিয়ে বড্ড বেশি কথা বলছি। কারও মনে হতে পারে ইসলামের মৌল চেতনা ও গুরুত্বকে উপেক্ষা করছি। আবার কারও মনে হতে পারে প্রয়োজনের তুলনায় ইসলামকে একটু বেশিই মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছি। তবে সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি কি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক?



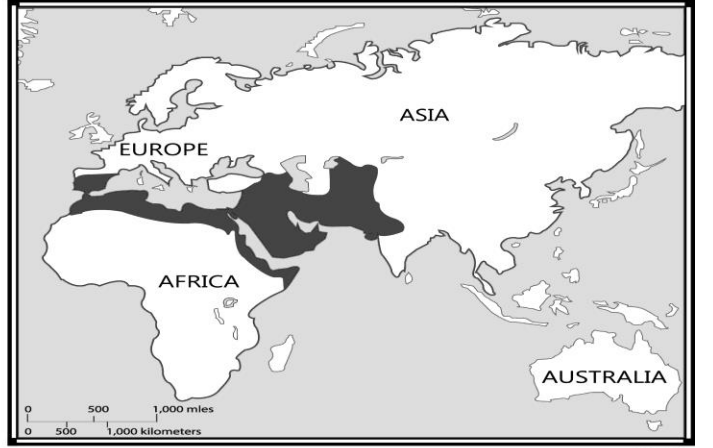
c.632



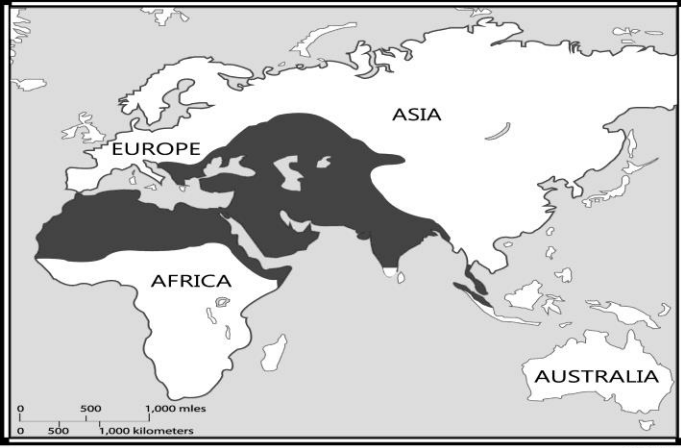
c.650



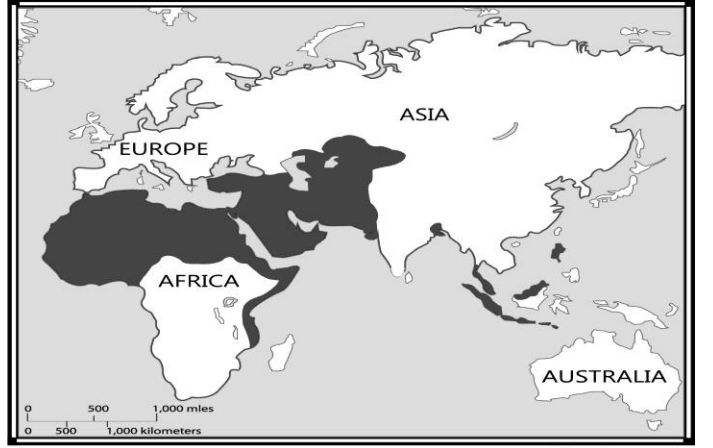
c.750



c.1150



c.1550



The Present

ইসলামের প্রসার

ওপরে দেওয়া এই ৬টি ম্যাপ দেখুন। ৬টি পৃথক সময়ে মুসলিম বিশ্বকে দেখানো হয়েছে।

‘মুসলিম বিশ্ব’ শব্দ দুটোর মাধ্যমে এমন জায়গাগুলোকে বোঝাতে চাচ্ছি, যেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা যে দেশগুলোর শাসক মুসলমান। অবশ্যই ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের কমবেশি সব জায়গাতেই মুসলমানরা বসবাস করছেন। তাই বলে এসব দেশকে ‘মুসলিম বিশ্ব’ দাবি করা মোটেই উচিত হবে না।

তবে আমি মুসলিম বিশ্ব বলে যা দাবি করছি, তা নিয়েও কিছু প্রশ্ন আসতে পারে। যেমন, এই মুসলিম বিশ্বটি কি ভৌগলিকভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই রকম ছিল? মুসলিম বিশ্ব ইতঃপূর্বে এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। আবার ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ার একটি বড়ো অংশ সেই আওতার বাইরেও ছিল। যদিও ইউরোপ আর আমেরিকাকে যুক্ত করলে যত বড়ো অঞ্চল হবে, এক সময় তার চেয়েও অনেক বড়ো অঞ্চল মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

অতীতে মুসলিম বিশ্বের এই গোটা এলাকাটি একটি একক রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় ছিল। অনেক মুসলমানের চোখে-মুখে এখনও সেই দৃশ্যপটই ভাসে। আবারও ওপরের ম্যাপগুলো দেখুন। কেউ কি এই ম্যাপগুলো দেখলে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে অস্বীকার করতে পারবেন? এমনকী ৯/১১-এর মতো ঘটনা ঘটার পরে মুসলমানদের ওপর সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বজুড়ে যে দমন-পীড়ন চলছে, এরপরও কি কেউ ইসলামের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে স্বীকার না করে পারবেন?

৯/১১-এর পর অনেক কিছুই আসলে পালটে গেছে। পশ্চিমা বিশ্বের অমুসলিম নাগরিকরাও এখন ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেছে। বিশেষ করে ইসলাম আসলে কেমন, মুসলমানদের আগের প্রজন্মের ইতিহাস, অতীতের সেই বিশাল মুসলিম বিশ্ব কেমন ছিল- এসব নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে। একই ধরনের কৌতূহল আমাকেও তখন গ্রাস করে। ৩৮ বছর পর সে বছরই আমি প্রথম আফগানিস্তান ও পাকিস্তান ভ্রমণ করি। সেই সফরে আমি সাথে নিয়েছিলাম *Islam in Modern History* নামক একটি বই। বইটি আমি লন্ডনের একটি লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। লেখক উইলফ্রেড ক্যান্ডওয়েল স্মিথ নামে এক ভদ্রলোক যিনি ম্যাকগিল এবং হার্ভার্ডে ধর্ম বিভাগের অধ্যাপক। স্মিথ এই বইটি লিখেছিলেন ১৯৫৭ সালে। মডার্ন হিস্টোরি বলতে তিনি বইটিতে যা বলেছেন, তাও প্রায় ৪০ বছর আগের ব্যাপার। তারপরও তার পর্যবেক্ষণগুলো আমাকে বেশ আকৃষ্ট করে। আমাকে বেশ আলোড়িত করে। ২০০২ সাল থেকে আমি আবার ইতিহাসের সেই অধ্যায়গুলোকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা শুরু করি।

স্মিথের সেই বইটি আমার সামনে নতুন এক পৃথিবীর দুয়ার খুলে দিলো। আমি শৈশব থেকে ইতিহাসের ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করতাম; বই পড়ার যে স্টাইলটা ফলো করতাম, স্মিথের বইটি তাতেও বেশ পরিবর্তন নিয়ে এলো। কাবুলে আমি যখন স্কুলে পড়তাম, একজন মানুষের কথা খুব শুনতাম। তার নাম সাইয়েদ জামালুদ্দিন আফগানি। অনেকের মতো আমিও তখন মনে করতাম, তিনি ইসলামের আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম শীর্ষ ও সফল ব্যক্তি।

কিন্তু সত্যি কথা কী, আমি কখনো এটা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করিনি, কীভাবে তিনি এত বড়ো একজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে ইসলামের একটি সাদামাটা রূপ নিয়েই কাজ করেছেন। যাকে প্যান-ইসলামিজম হিসেবে অভিহিত করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যাটি ইসলামের মলিন একটি চেহারা বলেই মনে হয়। কারণ, তার ব্যাখ্যা করা ইসলাম অনেক বেশি জাতীয়তাবাদকে ধারণ করে। স্মিথের বইটি পড়ার পরে আমি ইসলামিজম তথা ইসলামের রাজনৈতিক রূপটি সম্পর্কে জানতে পারি। আর আমি যখন এই ‘ইসলামিজম’

শব্দটির সাথে পরিচিত হলাম ২০০১ সালে; ঘটনাচক্রে এই ‘ইসলামিজম’ শব্দটিই তখন বিশ্বজুড়েই প্রবলভাবে আলোচিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো, এরও প্রায় ১০০ বছর আগে কাল মার্কস এই ‘ইসলামিজম’ সম্পর্কে বলে গেছেন। মুসলমান হওয়ার পরও আমার কাছে অপরিচিত থাকলেও ‘ইসলামিজম’ শব্দটি অমুসলিমদের কাছে খুব একটা অজানা ছিল না।

এহেন পরিস্থিতিতে আমি মুসলমানদের ইতিহাসকে আরও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করি। এখন আর শুধু নিজের অতীত পরিচয়কে অনুসন্ধান করাই আমার উদ্দেশ্য নয়। চারপাশের মুসলমানদের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে বিশাল পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছিলাম। এই পরিবর্তনের কারণ ও শেকড় অনুসন্ধান করাই আমার ইতিহাস অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। বিশেষ করে আফগানিস্তানের ভয়ংকর ঘটনাগুলো, ইরানের ঘটনাপ্রবাহ, আলজেরিয়ার বিদ্রোহ, মধ্যপ্রাচ্যে হামলা ও আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা আর সর্বশেষ তালেবানদের উত্থান— এসব ঘটনা আমাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। আমি অনুভব করি, আমাদের মুসলমানদের ইতিহাসের সেই পাঠ উদ্ধার করতে হবে, যার মাধ্যমে বোঝা যায় কোথা থেকে শুরু হয়ে ইসলাম ও মুসলমানরা আজকের এই জায়গায় এসে পৌঁছাল।

ধীরে ধীরে চলমান বিশ্বের নানা ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম। আমেরিকা বা ফ্রান্সের মতো পৃথিবীব্যাপী মুসলিম জগতের ইতিহাসগুলো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। আর মুসলমানদের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উপাখ্যান ও বক্তব্য সহজলভ্য করা যায়নি। অথচ মুসলমানদের ইতিহাস এতটাই বিস্তৃত ও ব্যাপক যে, শুধু এটা দিয়েই পৃথক একটি বিশ্ব ইতিহাস দাঁড় করানো যায়। আমি বেশ অনুধাবন করতে পারছিলাম, বছর কয়েক আগে ট্রেসাসের ওই প্রকাশক আমাকে যে কাজটি করতে বলেছিলেন কিংবা ম্যাকডোগাল লিটেল যে বইটি প্রকাশ করেছিলেন, তা আসলে ইসলামের সেই ইতিহাস, যা আমি আমার অবচেতন মনে এতগুলো বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আসলে ‘বিশ্ব ইতিহাস’ বা ‘ইসলামের ইতিহাস’ যে নামেই এদেরকে আলাদা করি না কেন, তার সূত্রপাত কিন্তু একই জায়গায়; প্রাচীন ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর দুই প্রান্তে। সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমা জগৎ ও মুসলিম জগৎ বর্তমানের এই কঠিন সময়ে এসে দাঁড়িয়ে এখনও নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে লড়াই করে যাচ্ছে। এই লড়াইয়ের জায়গার বাইরে আবার উভয়ের মধ্যে কাঠামোগত কিছু অদ্ভুত সাদৃশ্য বা মিলও আমাদের চোখে ধরা পড়ে। পশ্চিমা বিশ্বের ঐতিহাসিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে একটি রাষ্ট্র কাঠামোই তাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। আর সে রাষ্ট্র কাঠামো হলো রোমান সাম্রাজ্য; যেখান থেকে আসলে বিশ্বজনীন রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধারণার সূত্রপাত ঘটে। অন্যদিকে, মুসলিম বিশ্বকেও আপনি যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেন না কেন, সেখানেও একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর তীব্র প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য সেটি রোমান সাম্রাজ্য নয়; বরং সেটি হলো খিলাফত।

পশ্চিমা দুনিয়া এবং মুসলিম দুনিয়ার এই প্রাথমিক রাষ্ট্র কাঠামোটি গোটা ইতিহাসের বিচারে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই দুটো সাম্রাজ্য আসলে বেশ দ্রুততম সময়ে অনেক বড়ো হয়ে ওঠেছিল। উত্তরের যাযাবর বর্বর সম্প্রদায়ের কারণে রোমানদের সাম্রাজ্য হুমকির মুখে পড়ে। আর ইসলামি রাষ্ট্রেও উত্তরের হুমকি ছিল, তবে সেই হুমকি আসলে এশিয়ার মধ্যাঞ্চল থেকেই সৃষ্টি হয়। রোমান সাম্রাজ্য জার্মান জাতির কারণে পতনের মুখে পড়লেও ইসলামি রাষ্ট্রের সেই আদি কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তুর্কিদের আত্মসনের কারণে। উভয় সাম্রাজ্যই বহিঃশত্রুদের আঘাতে ভেঙে যায় এবং তার মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অন্যদিকে, এই ভাঙন বা বিভাজনের ফলে নতুন করে ধর্মীয় একটি মেরুকরণও হয়। পশ্চিমা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ক্যাথলিক মতাদর্শ, অন্যদিকে মুসলিম জগতের পূর্বাঞ্চলের কোলে সুন্নি মতাদর্শ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়।

বিশ্ব ইতিহাস মানেই হলো কীভাবে আমরা বর্তমান অবস্থানে আসলাম, সেই আলোচনার একটি গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ। তাই ‘আমরা’ বলতে কাকে বুঝাচ্ছি বা ‘বর্তমান অবস্থান’ বলতেই বা কী বোঝানো হচ্ছে, তা নিরূপণ করা অত্যন্ত জরুরি। পশ্চিমা বিশ্ব ‘বর্তমান অবস্থান’ কথাটি দিয়ে মূলত মোটাদাগে শিল্প বিপ্লব পরবর্তী গণতন্ত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকেই বুঝিয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘বর্তমান অবস্থান’ বলতে আরেকটু ব্যাপক কিছু বোঝানো হয়। আমেরিকায় ‘বর্তমান অবস্থান’ বলতে শিল্প বিপ্লব তো বটেই, তার পাশাপাশি তার নিজেদের স্বাধীনতা, জাতি হিসেবে আমেরিকানদের প্রতিষ্ঠা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মূল দুই ভিত্তি তথা স্বাধীনতা ও সাম্যকেও বোঝানো হয়। সেইসঙ্গে কীভাবে সাধারণ একটি জাতিরাষ্ট্র থেকে আমেরিকা বিশ্বের অন্যতম সুপার পাওয়ার-এ পরিণত হলো, সেই আলোচনাটিও ইতিহাসের পর্যালোচনায় তারা সামনে নিয়ে আসতে চায়।

আমরা এসব আলোচনা থেকে আরও বুঝতে পারি, বেশিরভাগ জাতি একই লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও সবাই একই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। কেউ হয়তো দেরিতে শুরু করে বলে পিছিয়ে যায়, কেউ বা খুব দীরগতিতে এগানোর জন্য পিছিয়ে পড়ে। আর এই ধরনের পিছিয়ে পড়া জাতিগুলোকেই আমরা ‘উন্নয়নশীল রাষ্ট্র’ হিসেবে অভিহিত করে থাকি।

আমরা যদি পশ্চিমা জগতের শিল্প বিপ্লব পরবর্তী গণতন্ত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ইতিহাসকে এখনও পর্যন্ত যাত্রা পথের শেষ পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে সেই ইতিহাস বর্ণনার কিছু ধাপ আমাদের সামনে আসবে। সেগুলো হলো :

১. সভ্যতার জন্ম (মিসর ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতা)
২. ক্ল্যাসিক্যাল এজ বা চিরায়ত যুগ (গ্রিস ও রোম)
৩. দ্য ডার্ক এজ বা অন্ধকার যুগ (খ্রিষ্টান তত্ত্বের উত্থান)
৪. দ্য রিবার্থ বা পুনর্জন্ম : রেনেসাঁস এবং রিফর্মেশন (সংস্কার)
৫. দ্য অ্যানলাইটমেন্ট (নতুন নতুন আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রা)

৬. দ্য রেভুলেশন বা বিপ্লব (গণতান্ত্রিক, শিল্প ও বিজ্ঞান ভিত্তিক)
৭. রাইজ অফ নেশন স্টেটস (জাতিরাষ্ট্রের উত্থান)
৮. প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
৯. দ্য কোল্ড ওয়ার
১০. গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের জয়জয়কার

যদি আমরা ইসলামের আলোকে বিশ্ব ইতিহাসকে পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা কী দেখব? আমরা ইসলামের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে যদি পশ্চিমাদের মতোই ওপরোক্ত পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করে তাদের দেখানো পথেই শেষ করি, তাহলে তা মোটেও সঠিক ইতিহাস হবে না। কারণ, আমাদের শুরু আর শেষের সংজ্ঞা তাদের থেকে পুরোই আলাদা। ইসলামের দৃষ্টিতে শুরুর পয়েন্ট পশ্চিমাদের দেখানো শুরু থেকে আলাদা। মুসলমানদের চোখে পুরো সময়কাঠামো একটা পয়েন্টকে ভিত্তি ধরে দুভাগে বিভক্ত। এই পয়েন্ট হচ্ছে নবিরাজির হিজরতের সময়। ইসলামের ইতিহাস পাঠ করতে গিয়ে আমরা ‘জিরো (০)’ সময় হিসেবে বিবেচনা করব প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিজরতের সময়কে। এসময় তিনি মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসেন। সেদিন থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের নতুন (অতীতেও ছিল) অভিযাত্রা শুরু হয়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে এসে দেখা যাচ্ছে, অনেক কিছুই আর আগের মতো করে হচ্ছে না। খ্রিষ্টান বা মুসলমান সম্প্রদায় অতীতে যেভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করত, এখন আর সেভাবে সাম্রাজ্য প্রসারণের কাজটিও হচ্ছে না; বরং এই সম্প্রদায়গুলোর নিজেদের মধ্যেই নানা ধরনের টানাপোড়েন বা সংশয়ের জন্ম হয়েছে। আমাদেরকে মুসলমানদের ইতিহাস এমনভাবে চেনানো হয়েছে, যেখানে আমরা বিজয়ের নয়; বরং বারবার পরাজয়ের গল্পই শুনেছি। আমরা এখনও একটা বড়ো সংশয়ের মধ্যে ডুবে আছি। আমরা কি ইতিহাসের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ‘সভ্যতা’ সম্পর্কে আমাদের ধারণাটিকেই পালটে ফেলব, নাকি ইতিহাসের প্রচলিত গতিপথের সাথে লড়াই করে নিজেদের মতো করে সভ্যতার একটি নতুন সংজ্ঞা দাঁড় করাব?

বর্তমানের এই দৌদুল্যমনতাকে যদি আমরা মুসলমানদের সর্বশেষ সাম্প্রতিক অবস্থান মনে করে মুসলিম ইতিহাসের আদ্যোপান্ত রচনা করতে শুরু করি, তাহলে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো আমাদের সামনে আসবে।

১. প্রাচীন সময় (মেসোপটেমিয়া ও পারসিয়ান)
২. ইসলামের প্রাথমিক যুগ
৩. খিলাফত : বিশ্বজনীন একক সাম্রাজ্যের সন্ধান
৪. বিভক্তি : সুলতানি আমল
৫. বিপর্যয় : ক্রুসেডার্স এবং মোঙ্গল

৬. পুনর্জন্ম : তিনটি বড়ো সাম্রাজ্য
৭. পশ্চিমাদের প্রাচ্য আত্মসন
৮. সংস্কার আন্দোলন
৯. আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উত্থান
১০. ইসলামপন্থীদের প্রতিক্রিয়া

বিশ্বখ্যাত সাহিত্য সমালোচক অ্যাডওয়ার্ড সাইদ দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, পশ্চিমারা ইসলাম সম্বন্ধে ‘প্রাচ্য’ নামের একটি কল্পিত জগৎ সৃষ্টি করেছে। যেখানে ইসলামপন্থীদের বিভিন্ন চিন্তা-কাঠামোর ভিন্নতাকে প্রতিহিংসা বা পরশীকাতরতার মোড়কে দেখানো হয়েছে। ইসলামের সমৃদ্ধ অতীতকে ক্ষয়িষ্ণু হিসেবেও পরিচিত করানো হয়েছে।

এ কথা ঠিক যে, ইসলামকে একটি ভিন্ন ও কল্পিত আকারে পশ্চিমাদের সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল, যার মধ্যে অনেক কিছুই সত্যের তুলনায় কম-বেশি ছিল। পশ্চিমারা কী করল কিংবা তারা ইসলামকে কীভাবে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে দেখাল, তার তুলনায় আমার কাছে যেটা বড়ো প্রশ্ন সেটা হলো, আমরা নিজেরাই কি আজ পর্যন্ত ইসলামের সঠিক ও সত্য কোনো ইমেজ দাঁড় করাতে পেরেছি? ছোট্ট একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতায়নের ব্যাপারটি ঘটেছিল ইসলামের ৩টি সাম্রাজ্যে। কিন্তু মুসলমানরা সেই গৌরবময় ইতিহাসের কতটুকুই বা জানে!

আমাদের দুটো ঐতিহাসিক বাস্তবতা বুঝতে হবে। পশ্চিমা এবং ইসলামি যুগের ইতিহাস। এই দুইটি যুগ আসলে একে অন্যকে কতটা স্বীকৃতি দেয় বা কতটা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে, এটা পর্যালোচনা করাটাও জরুরি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্ব সবসময়ই যেন দুটো ভিন্ন পৃথিবী ছিল। তাদের প্রত্যেকের ইতিহাসেই নিজেদের মতো করে কিছু বিষয় ছিল। এরা উভয়ই মানব ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার চেষ্টাও করেছে। ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত এই দুটো ধারার গতি প্রকৃতিও ভিন্ন ছিল। ১৭শ শতাব্দীতে এসে যখন পশ্চিমারা শক্তিশালী হয়ে মুসলমানদের অর্জনগুলোকে গায়ের জোরে কেড়ে নিতে চেষ্টা করে, তখন থেকেই আসলে ইতিহাসের নতুন সংকটের সূত্রপাত হয়।

ইতিহাসকে আসলে কখনোই দমিয়ে রাখা যায় না। এটা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবেই। আপনি যখন ঝঞ্ঝা-বিস্ফুরক বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকাবেন, বিশেষ করে যখন কাশ্মীর, ইরাক, চечনিয়া, বলকান, ইজরাইল বা ফিলিস্তিন নিয়ে ভাববেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন প্রাচীরের ওপার থেকে আবার নতুন কিছু একটা বের হয়ে আসতে চাইছে। আপনি বুঝে যাবেন, এই জায়গাগুলোকে আসলে কৌশলে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হলেও তা এখনও মরেনি; বরং ক্ষণে ক্ষণে মাথা বের করে বাঁচার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আর ইতিহাসের সেই কম চর্চিত গল্পগুলোই এই বইটির পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বলব। ডেসাটিনি ডিজরাপ্টেড নামের এই বইটি কোনো পাঠ্যবই নয়, আবার কোনো গবেষণাগ্রন্থও নয়। এটা অনেকটা গল্পের মতো। ধরুন, আপনি একটি কফি শপে আমার কাছে প্রচলিত বিশ্ব ইতিহাসের সমান্তরাল আরেকটি ইতিহাস জানতে চাইলেন। তখন আমি যা বলব, তা হয়তো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সারিসারি সাজানো বইতে ঠিকই লুকানো আছে। যদি আপনি একাডেমিক ভাষায় বা ফুটনোট দিয়ে তথ্যাদি জানতে চান, তাহলে সেই বইগুলোই পড়তে পারেন। আর যদি গল্প আকারে পড়তে চান, তাহলে আমার এই বইটি পড়তে পারেন। আমি কোনো স্কলার বা প্রচলিত ধারার শিক্ষাবিদ নই। আমি এই বইটিতে তা-ই সন্নিবেশিত করেছি, যা অসংখ্য স্কলাররা ইতিহাসের নানা উপকরণ থেকে ঘেঁটে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছেন। আবার একইসঙ্গে আমি এখানে অসংখ্য গবেষকের গবেষণালব্ধ তথ্যাবলিও সংযোজন করার চেষ্টা করেছি।

ইতিহাস এমন একটি বিষয়, যা কয়েক হাজার বছরের উপাখ্যানকে বিবৃত করে। তবে সব ঘটনা বা সব যুগকে সমানভাবে আলোচনায় নিয়ে আসা সম্ভবও নয়। আমি মূলত প্রিয়নবি ﷺ এবং তাঁর পরবর্তী চার খলিফার যুগকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছি। কারণ, ইসলামের একটি মৌলিক বিবরণ এখান থেকেই দাঁড় করানো সম্ভব। আমি সেই সময়ের ঘটনাবলিকে মানুষের স্বাভাবিক নাটকীয় দৃশ্যপট হিসেবেই দেখাতে চেয়েছি। কারণ, মুসলমানরাও সেই সময়ের ঘটনাগুলোকে সেভাবেই জানে। এই সময়গুলোতে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা অমুসলিমরাও বর্ণনা করেছেন। তবে মুসলমানরা সাধারণত মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনাকেই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন। আমি মূলত এই বইটিতে মুসলমানরা যা ধারণা করে, তা-ই উপস্থাপন করতে চেয়েছি। কারণ, মুসলমান সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই ধারণাগুলোই বারবার মুসলমানদেরকে আলোড়িত করেছে এবং বিশ্ব ইতিহাসে তাদের ভূমিকাও সেভাবেই আবর্তিত হয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয়কে আমি গুরুত্ব দিতে চাই। তা হলো, ইসলামের যেকোনো বিষয়ের মূল বা শিকড়ের বিশ্বাসযোগ্যতা। অন্যান্য ধর্ম যেমন— ইহুদি, বৌদ্ধ, হিন্দু এমনকী খ্রিষ্টানদের মতো করে ইসলামের তথ্যগুলো আসেনি। মুসলমানরা যেকোনো ঘটনা ঘটনার সাথে সাথেই তা সংগ্রহ করত, মুখস্থ করত, তিলাওয়াত করত এবং সংরক্ষণ করত। তারা যে শুধু মুখে মুখে এসব ঘটনাবলি সংরক্ষণ করত তাই নয়; বরং প্রতিটি ঘটনার তথ্যসূত্র, সাক্ষীর নামও লিখে রাখত। কিংবা একটি ঘটনা কেউ একজন কারও কাছ থেকে শুনল এবং পরবর্তীকালে সেই শ্রোতার কাছ থেকে অন্য কেউ আবার তা শুনত। সেভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তথ্যগুলো যেভাবে আসত, তা একেবারে নাম ও সাক্ষীসহ ইসলামে সংরক্ষণ করার বিধান আছে, যা আর কোনো ধর্মে নেই।

এতদসত্ত্বেও আমরা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত গল্পকেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ গ্রহণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করছি না। গ্রহণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে কোনো কিছুকে মানতে হলে, আমরা তার সপক্ষে প্রমাণ দেখতে চাই। মুসলিম ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা যেই নীতি অনুসরণ করেছি, তা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। যে কাহিনিগুলো মুসলমানদের মধ্যে থেকে পেয়েছি, তার সত্যতা যাচাইয়ের সাথে সাথে আমরা সেই ঘটনা থেকে পাওয়া শিক্ষাটাকে নিয়ে বেশি কাজ করতে চেয়েছি। সেই শিক্ষাটা কতটা সত্য বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতটা বাস্তব, তাই নিয়েই আমরা বেশি উৎসাহী ছিলাম। মুসলিম ইতিহাসের সকল গল্পের চরিত্রগুলো আদর্শ মুসলমান বা আদর্শ মানুষ- এমন দাবি আমরা করছি না। তবে তারা তাদের চলার পথে যে ধরনের সংকটে পড়েছিলেন, তা ইতিহাসকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে বা কীভাবে আমরা সেসব বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের সময়গুলোতে চলতে পারি, এটা উদ্ঘাটন করাই আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি।

এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, মুসলিম ইতিহাসের নানা গল্পও রূপকভাবে আমাদের সামনে এসেছে। এর কিছু কিছু নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, আবার কিছু গল্প আছে যা কিছু সুনির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা বা ব্যক্তিকে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার জন্য গল্পের বর্ণনাকারী কিছুটা নিজের মতো করে এদিক-সেদিকও করেছেন। তারপরও আমরা দেখেছি, প্রাচীন রোমে সুন্না এবং মারিয়াস যেভাবে নির্মোহভাবে ইতিহাসের বর্ণনা করে গেছেন, মুসলমানদের অনেকেই তাদের নিত্যদিনের ঘটনাগুলো ইতিহাসের মোড়কে ঠিক সেভাবেই আমাদের সামনে বর্ণনা করে গেছেন। আমিও একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এই বইটিতে ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। চলুন শুরু করি ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাসের পাঠ।

সূচিপত্র

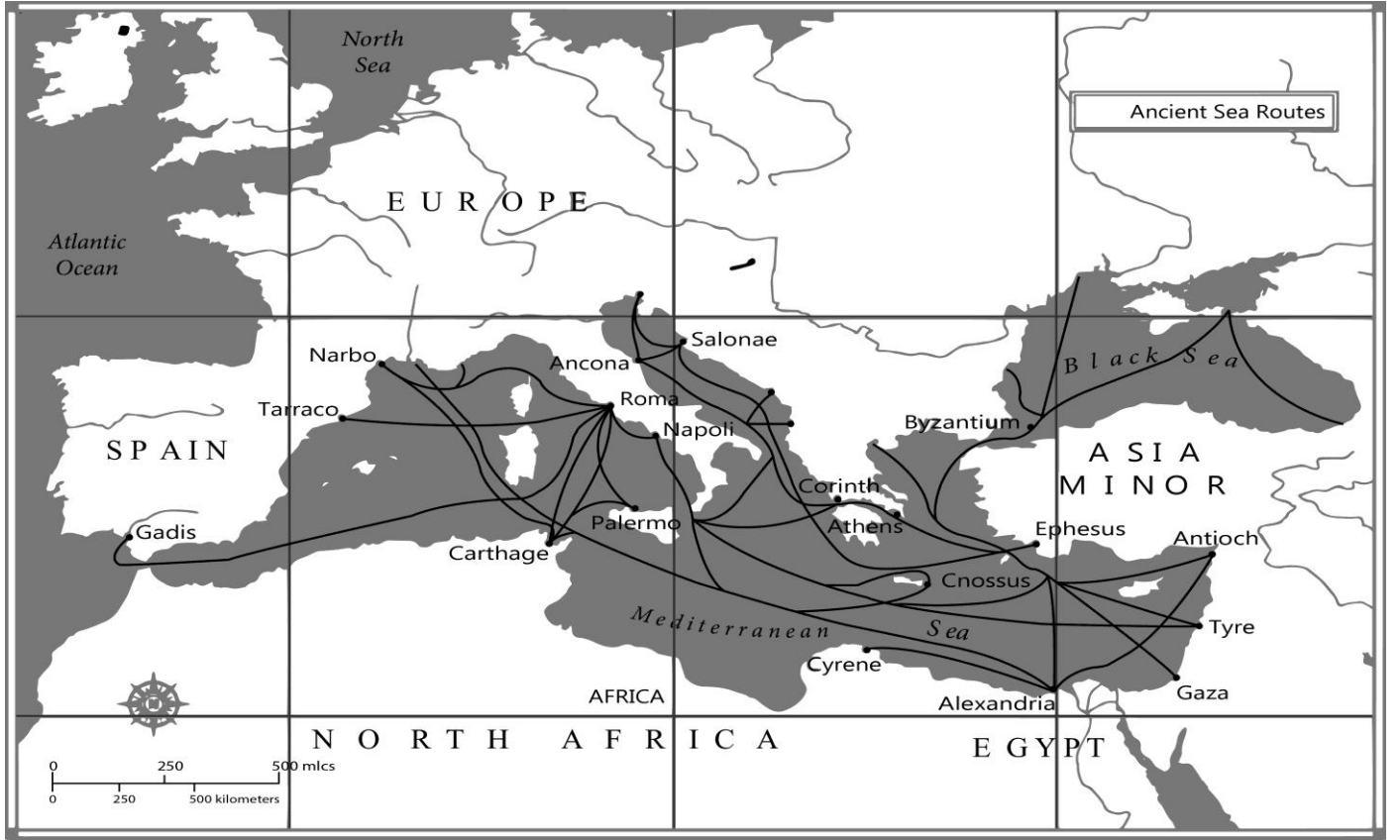
১.	মধ্য পৃথিবী (দ্য মিডল ওয়ার্ল্ড)	২৯
২.	দ্য হিজরা (শূন্য বছর বা ইয়ার জিরো) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	৪৮
৩.	খেলাফতের জন্ম হিজরি ১১-২৪ বা ৬৩২-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ	৬৭
৪.	বিভেদ-বিভাজন (২৪-৪০ হিজরি) ৬৪৪-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ তৃতীয় খলিফা (২২-৩৬ হিজরি, ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)	৯৪
৫.	উমাইয়া সাম্রাজ্য (৪০-১২০ হিজরি) ৬৬১-৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দ	১১২
৬.	আব্বাসি যুগ (১২০-৩৫০ হিজরি) ৭৩৭-৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ	১২৭
৭.	জ্ঞানী, দার্শনিক ও সুফি সাধকদের যুগ (১০-৫০৫ হিজরি) ৬৩২-১১১১ খ্রিষ্টাব্দ	১৩৯
৮.	তুর্কিদের আবির্ভাব ও উত্থান (১২০-৪৮৭ হিজরি) ৭৩৭-১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ	১৬৯
৯.	ব্যাপক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য (৪৭৪-৭৮৩ হিজরি) ১০৮১-১৩৮১ খ্রিষ্টাব্দ	১৮৮
১০.	পুনরুত্থান (৬৬১-১০০৮ হিজরি) ১২৬৩-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ	১১১
১১.	ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা (৬৮৯-১০০৮ হিজরি) ১২৯১-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ	২৭০
১২.	পাশ্চাত্যের প্রাচ্যমুখী অভিযান (৯০৫-১২৬৬ হিজরি) ১৫০০-১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ	২৯২
১৩.	সংস্কার আন্দোলন (১১৫০-১৩৩৬ হিজরি) ১৭৩৭-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ	৩২৯
১৪.	শিল্প, সংবিধান ও জাতীয়তাবাদ (১১৬৩-১৩৩৬ হিজরি) ১৭৫০-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ	৩৫৫
১৫.	ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকপন্থীদের উত্থান (১৩৩৬-১৩৫৭ হিজরি) ১৯১৮-১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ	৩৯১
১৬.	আধুনিকতার সংকট (১৩৫৭-১৩৮৫ হিজরি) ১৯৩৯-১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ	৪১১
	পরিশিষ্ট	৪২৬

① মধ্য পৃথিবী

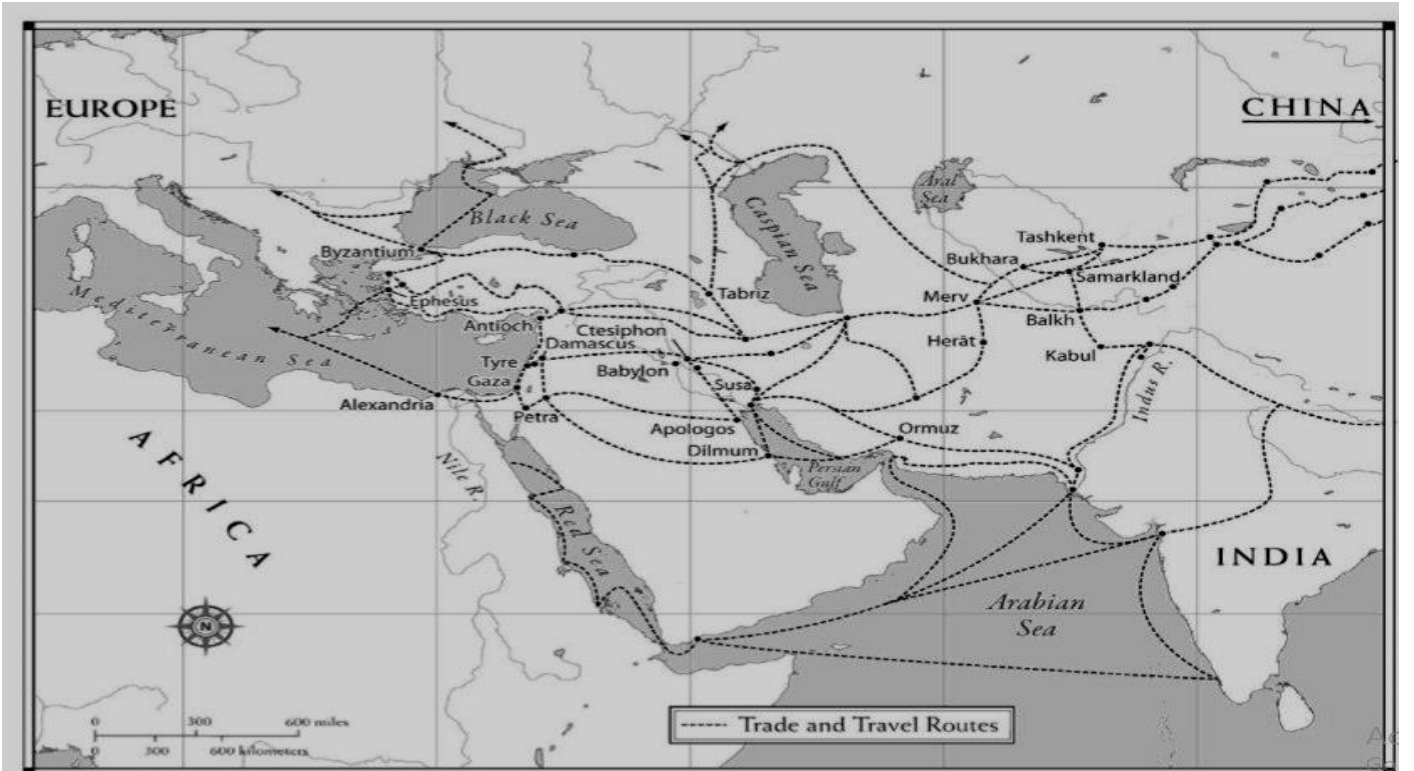
মানবতার বন্ধু প্রিয় নবিজি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ রিসালাতের বার্তা নিয়ে এই পৃথিবীতে আসার বহু আগেই তৎকালীন পৃথিবীতে দুটো ভিন্ন ধরনের পৃথিবী (দুটো বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য, যা কাঠামোগত ও চেতনাগত দিক থেকে এতটাই আলাদা যেন দুটো দুই ভিন্ন পৃথিবী) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আটলান্টিক মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী অববাহিকায় এই দুই পৃথিবীর অবস্থান। দুটো ভিন্ন ধারার পৃথিবীর ভ্রমণ ও বাণিজ্যপথগুলোও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এক পৃথিবীতে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল মূলত সমুদ্রপথ আর অন্যটি ছিল স্থলপথ।

যদি আপনি প্রাচীন সময়ের সমুদ্রপথটি পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে দেখবেন বাস্তবিক অর্থে বিশ্ব ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র ছিল ভূমধ্যসাগর। কারণ, ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করেই অতীতের মাইসেনাইয়ান, ক্রিটান, ফোয়েনিসিয়ান, লিডিয়ান, গ্রিক বা রোমানদের মতো প্রসিদ্ধ জাতিগুলো আর তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়েছিল। সেই সময়ে যারা ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে থাকত, তারা খুব সহজেই এই অঞ্চলে থাকা অন্যান্য জাতি-উপজাতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন বা তথ্য বিনিময় করতে পারত। তাই এই বিশাল সমুদ্র উপত্যকা ক্রমান্বয়ে বৈচিত্র্যময় মানুষের মিলনস্থলে পরিণত হয়। সেইসঙ্গে তারা তাদের নিজেদের মতো করে কাহিনি রচনা ও প্রচার করার কারণে একটি ঘটনাবহুল এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক উপাখ্যানও রচিত হয়। আজকের পশ্চিমা সভ্যতা মূলত সেই ইতিহাসেরই একটি পরিণতি।

এবার আপনি আরেকটি ধারার দিকে তাকান। স্থলপথই ছিল সে ধারার যোগাযোগ মাধ্যম। ভারতীয় উপমহাদেশ, মধ্য এশিয়া, ইরানের সুউচ্চ ভূমি, মেসোপটেমিয়া এবং মিসরের এলাকার সাথে সংযুক্ত সড়কগুলো এ যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এই এলাকায় অনেক নদী আর সাগরেরও অবস্থান ছিল। যেমন : এখানে ছিল পারস্য উপসাগর, ইন্দু (সিন্ধু) ও অক্সাস নদী, অ্যারাল ও কাস্পিয়ান সাগর, ব্ল্যাক সি, ভূমধ্যসাগর, নীল নদ এবং লোহিত সাগর। মূলত এই অঞ্চলকে ঘিরেই মুসলিম বিশ্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়। (এখানে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বা সাম্রাজ্য বলতে আজকের ইউরোপ এবং মধ্য পৃথিবী বলতে আজকের মুসলিম বিশ্বকে বোঝানো হয়েছে)। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মুসলিম বিশ্বের এই এলাকাগুলোকে আলাদা করে কোনো নামকরণ করা হয়নি।



ভূমধ্যসাগর অঞ্চল (মেডিটেরিয়ান অঞ্চল)



ভূমধ্যসাগর অঞ্চল (মেডিটেরিয়ান অঞ্চল)

উপরোক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি অংশকে মধ্যপ্রাচ্য হিসেবে অভিহিত করা হলেও তার নামকরণের কারণটি বেশ দুর্বোধ্য। ধরুন, মধ্যপ্রাচ্য বা প্রাচ্যের মাঝখানে শুনলে সাধারণভাবে মনে হয় আপনি পশ্চিম ইউরোপের বিপরীতে কোনো স্থানে আছেন। ধরুন, আপনি পারস্য উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি এখন কোথায় আছেন? তাহলে বিশ্বের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী আপনি আসলে মধ্য পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ মজার ব্যাপার হলো জায়গাটির নাম আসলে মধ্যপ্রাচ্য। নাম নিয়ে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে আমি মধ্যপ্রাচ্য না বলে ইন্দুস বা সিন্ধু নদী থেকে শুরু করে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত গোটা এলাকাটিকে ‘মধ্য পৃথিবী’ হিসেবে অভিহিত করেছি। আমার এই নামটি দেওয়ার পেছনে যুক্তি হলো, আসলে এই এলাকাটি ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্য এবং চৈনিক সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি একটি জায়গায় অবস্থিত। তাই একে মধ্য পৃথিবী বললেই বেশি যুক্তিসংগত হয়।

চৈনিক পৃথিবীর একটি আলাদা জগৎ ছিল যা ওপরোক্ত বড়ো দুই জগতের তুলনায় পুরোটাই আলাদা। চীন ভৌগোলিকভাবে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার হিসেব থেকে দূরত্বের কারণে বাদ পড়ে গেল। আর মধ্য পৃথিবী থেকে চীন আলাদা হয়ে পড়ল হিমালয়, গোবি মরুভূমি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘন বনাঞ্চলের কারণে। এসব প্রাকৃতিক সীমানা প্রাচীরের কারণেই চীন এবং তার নিকটস্থ বন্ধু বা বিদ্রোহীরা একটু দূরে দূরে থাকত। ঠিক সে কারণেই মধ্য পৃথিবীর ইতিহাসে খুব একটা চৈনিক উপাদানের প্রভাব পাওয়া যায় না। তাই এই বইতেও চাইনিজদের নিয়ে কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই কম এসেছে। একইভাবে কম এসেছে সাব-সাহারা আফ্রিকানদের কথাও। সাহারা মরুভূমির কারণে এই গোটা সাব-সাহারা অঞ্চলটিও ইউরোপ বা এশিয়া থেকে মোটামুটি বিচ্ছিন্ন হয়েই থেকেছে। আবার ভৌগোলিকভাবে ভিন্নতার কারণে আমেরিকাও মোটামুটি ইউরোপ বা এশিয়ার বলয়ের বাইরে থেকে নিজেদের মতো করে একটি পৃথিবী বানিয়ে নিয়েছিল। একইসঙ্গে তারা নিজেদের মতো করে নিজস্ব একটি ইতিহাসও তৈরি করেছে।

ভৌগোলিক অবস্থানগত এই ভিন্নতা চীন বা আমেরিকাকে যতই বিচ্ছিন্ন করুক না কেন, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বা মধ্য পৃথিবীর মধ্যে তেমন কোনো বিচ্ছিন্নতা কখনোই সৃষ্টি করতে পারেনি। এই দুটো অঞ্চল তাদের মতো করে যে দুটো পৃথক পৃথিবী বানিয়ে নিয়েছিল, তার কারণ বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ফিলিপ ডি কার্টিন বলেছেন, এই দুই অঞ্চলের এই ভিন্নতার মূল কারণটি ছিল আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা। এই দুই অঞ্চল একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করার চেয়ে নিজেদের এলাকার ভেতরে যোগাযোগ রক্ষা করাটাকেই বেশি গুরুত্ব দিত। কারণ, সেটাই সহজ ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় কোনো উপকূল থেকে ভূমধ্যসাগরের অন্য কোনো উপকূলের নিকটবর্তী এলাকায় যাওয়া খুবই সহজ ছিল। কিন্তু সেই তুলনায় ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে ইন্দুস (সিন্ধু) নদী তীরবর্তী এলাকায় যাওয়া ছিল বেশ কঠিন। অন্যদিকে, সেই প্রাচীনকাল থেকে মধ্য পৃথিবীতে যেই বণিকেরা আসা যাওয়া করতেন, বিশেষ করে ক্যারাভান নিয়ে যারা যাতায়াত করতেন,

তারা যেকোনো সময় যেকোনো দিকে বাঁক নিতে পারতেন। তাদের কাছে এই এলাকাটি খুবই পরিচিত ছিল। তারা সবসময় পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতেন। এই পথে যেতে যেতে যখন তারা এশিয়া মাইনর অঞ্চলের (আজকের তুরস্ক) কাছাকাছি আসতেন, তখন একটা পর্যায়ে বসফরাস প্রণালীর নিকটে এসে পথটা খুব সরু হয়ে যেত। আর এরও পরে বিশাল সাগর থাকায় তারা আর অগ্রসর না হয়ে আবার কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসতেন অথবা দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় এলাকা ধরে অগ্রসর হতেন।

সে সময়ে মানুষের জীবনযাত্রার ধরন এমন ছিল যে, নতুন কোনো কিছু কেবল ব্যবসায়ী বা পর্যটকদের মাধ্যমেই মানুষের নজরে আসত। এক একটি বণিক দল শুধু যে ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে ঘুরত তা নয়; বরং তারা তাদের সাথে নানা ধরনের গাল-গল্পো, চমকপ্রদ কাহিনি, কৌতুক, গুজব, ঐতিহাসিক বর্ণনা, ধর্মীয় পুরাকীর্তিগাঁথা এবং সাংস্কৃতিক অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে চলতেন। যেন এক একটি বাণিজ্য দল এক একটি সভ্যতার বীজ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা যে চিন্তা-চেতনা নিয়ে একটি জনপদে প্রবেশ করতেন, দেখা যেত তাদের প্রস্থানের পর সেসব চিন্তা-চেতনার অনেক কিছুই সেই জনপদের মানুষের স্বভাবে-আচরণে ঢুকে গেছে। এভাবে একটি লোকালয়ের সংস্কৃতি আরেকটি লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করত। সাংস্কৃতিক চেতনা বিনিময়ের কাজটিও আসলে এভাবেই সম্পন্ন হতো।

এভাবেই ভূমধ্যসাগরীয় এবং মধ্য পৃথিবীর ইতিহাসগুলো রচনা হয়েছে। যারা ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় বসবাস করতেন। তাদের এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, তারাই আসলে মানব ইতিহাসের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছিলেন। অন্যদিকে, যারা মধ্য পৃথিবীর অধিবাসী তারাও যৌক্তিকভাবেই ভেবে নিতে পারেন যে, তারা একেবারে পৃথিবীর মূল কেন্দ্রেই থাকতে পেরেছেন।

এই দুই ভিন্ন পৃথিবীর ইতিহাস বারবার একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকে গেছে, কখনো অতিক্রম করে গেছে বেশ কিছু জায়গায়। মজার ব্যাপার হলো, আজ এত বছর পরে এসেও আমরা সেই জায়গাগুলোকেই সবচেয়ে অস্থির অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে ইজরাইল, লেবানন, সিরিয়া, জর্দান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এই স্থানগুলোকে যদি আমরা একটু আগে বর্ণিত দুই পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে মিলিয়ে দেখি, তাহলে দেখব এর কিছু অংশ পড়েছে সাগর প্রধান এলাকার পূর্ব প্রান্ত জুড়ে, আর কিছু অংশ পড়েছে স্থলযোগাযোগ নেটওয়ার্কনির্ভর পৃথিবীর পশ্চিমাংশ জুড়ে। তাই ভূমধ্যসাগরীয় ইতিহাসের আঙ্গিক থেকে বিচার করলে এই জায়গাগুলো সবসময়ই তাদের একেবারে মূল শিকড়ের অংশ ছিল। আর মধ্য পৃথিবীর ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখলে এই অঞ্চলগুলো তাদের। কারণ, মেসোপটেমিয়া এবং পার্সিয়ান অঞ্চলকে মধ্য পৃথিবী ঐতিহ্যগতভাবে তার নিজস্ব বলে মনে করে। সেই কারণেই এই অঞ্চলগুলোর কর্তৃত্ব নিয়ে আজ অবধি এই দুই পৃথিবীর কর্তব্যজ্ঞিরা লড়াই করে যাচ্ছেন।

ইসলামের ছোঁয়া পাওয়ার পূর্বে মধ্য পৃথিবীর চিত্র

আদিকাল থেকে যে মানব সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল, তা মূলত সৃষ্টি হয়েছিল বড়ো বড়ো নদী বা প্লাবনকে কেন্দ্র করে। যেমন ধরা যাক, চীনের হুয়াংহো উপত্যকা, ভারতের ইন্দু নদী উপত্যকা কিংবা আফ্রিকার নীলনদ উপত্যকা। এসব স্থানে আজ থেকে ৬ হাজার বছর বা তারও পূর্ব থেকে যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা বসতি স্থাপন করেছিল, বাড়িঘর নির্মাণ করেছিল এবং এলোপাতাড়ি ঘোরাফেরা বন্ধ করে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেছিল। সভ্যতার গোড়াপত্তন কিন্তু সেখানেই।

মানব ইতিহাসে নদীকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো ও সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা সভ্যতা— যাকে ইতিহাসে ‘মেসোপটেমিয়া সভ্যতা’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মেসোপটেমিয়া মানে ‘নদীর মাঝখানে’। এই দুই নদীর তীরঘেঁষে যে বসতি গড়ে ওঠে, তা-ই আজকের ইরাক। সে কারণেই আমরা যখন সভ্যতার সূত্রপাত খুঁজতে যাব, তখন আমাদেরকে ইরাকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা অন্য সভ্যতাগুলো থেকে একটু এগিয়ে থাকার কারণ, এর দুই পাশে দুটো নদী ছিল। অন্য সভ্যতাগুলো সাধারণত একটি নদীকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার আরেকটি সুবিধাজনক দিক ছিল, এর নদীগুলোর তীর ছিল সমতল। তাই মানুষ এখানে আরামে ও সহজে বসত গড়তে পারত এবং যেকোনো দিক থেকে এই জায়গাগুলোতে যাতায়াত করতে পারত। আরেকটি ভালো দিক হলো, প্রকৃতি এখানকার মানুষের জন্য আলাদা করে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেনি। অন্যদিকে মিসরীয় সভ্যতার নীলনদের কথা একবার চিন্তা করুন। নীল নদের চারপাশে জলাভূমি বেশি ছিল।

আবার এর পশ্চিমে ছিল সাহারার মতো বিশাল একটি মরুভূমি; যা ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে খাড়া বাঁধের মতো ছিল। নীলনদকে কেন্দ্র করে মিসরীয়রা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল ঠিকই; কিন্তু প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অন্য জায়গার মানুষ সেখানে কম আসতে পারত। ফলে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দিক থেকে বিচার করলে মেসোপটেমিয়ার তুলনায় মিসরীয় সভ্যতা অনেকখানি পিছিয়ে ছিল।

মেসোপটেমিয়ার আরেকটি দিক হলো, এই সভ্যতা অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। নানা ধরনের উত্থান-পতন তাকে প্রভাবিত করেছে। প্রায় কয়েক সহস্র বছর এভাবে পার করার কারণে ভেতর থেকে কাঠামোগতভাবে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। এর পাশাপাশি যাযাবরদের সাথে স্থানীয় কৃষকশ্রেণির ক্ষমতার দ্বন্দ্বও বৃহৎ মেসোপটেমিয়া সাম্রাজ্যের ভিত গড়ে দেয়।

এই সভ্যতা কীভাবে এগিয়েছে, তা ইতিহাসের আলোকে খুঁজতে গেলে যে তথ্যগুলো আমাদের সামনে আসে, সেগুলো হলো প্রথমে কৃষকেরা প্রাকৃতিক জলাধার ও নদীগুলোকে সেচ কাজের জন্য ব্যবহার করে ভালো পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে। সমাজ যখন একটু একটু করে স্থিতিশীল হয়,

তখন সেখানে বেশ ভালোমানের ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার জন্য হয়। পরে আবার এসব শ্রেণির লোকদের একটি একক ক্ষমতার আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এভাবেই সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক দলের, সেখান থেকে রাষ্ট্রের, পরিশেষে যা একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এ রকম বড়ো রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি হওয়ার পর যারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকে, তারা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করে। সেই সুযোগে আশেপাশের নতুন কোনো যাযাবর জাতি এসে ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারা আবার তাদের মতো সাম্রাজ্য বিস্তারও করে। কয়েক বছর পরে এই যাযাবর নেতারাও আগের শাসকদের মতো আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে যায়। আবার নতুন কোনো জাতি এসে সেই সুযোগে শাসনভার দখল করে নেয়। এভাবেই চলতে থাকে বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের গবেষণা থেকে জানা যায়, সে সময় সভ্যতাগুলোর বারবার ভাঙন ও গড়ে উঠার প্রক্রিয়াটি অনেকটা এরকম— শুরু হতো বিজয় দিয়ে, সেখান থেকে একত্রিতকরণ, তারপর বিস্তৃতি, এরপর ভাঙন এবং শেষমেশ আবার বিজয়। ইবনে খালদুন সভ্যতা গড়ে উঠার সূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে ইতিহাসের একটি অন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিহাস অনুসন্ধানে আরও দেখা যায়, সাম্রাজ্য গঠন ও পতনের এই চক্রটি একই সময়ে একাধিক সাম্রাজ্যেও ঘটেছে। ধরা যাক, একটি সাম্রাজ্য নতুন করে যখন গড়ে উঠেছিল, তখনই হয়তো আরেকটি সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আবার দুটো সাম্রাজ্যই হয়তো ঠিকমতো চলছিল, কিন্তু পরস্পরের সাথে বিবাদে জড়িয়ে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় চলে গিয়েছিল। কিংবা একটি সাম্রাজ্য একটির পর একটি জায়গা দখল করে হয়তো অনেক বড়ো সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, এমন ঘটনাও ইতিহাসে অসংখ্যবার পাওয়া যায়।

প্রায় ৫ হাজার ৫শ বছর আগে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে থাকা সভ্যতাও একইভাবে একটি একক বৃহৎ সাম্রাজ্যের আওতায় এসেছিল। সে সময়ের ওই শাসনের নাম ছিল সুমের। সেই আমলেই প্রথম লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এ ছাড়া প্রথমবারের মতো চাকা, মালবাহী গাড়ি এবং সংখ্যার ধারণাও সে সময়েই পাওয়া যায়। এরপর আসে আক্কাদিয়দের যুগ। তারা সুমের জয় করে। আক্কাদিয়দের নেতার নাম ছিল সার্গন। ইতিহাসে সভ্যতার আদি বিজয়ী নায়ক হিসেবে তার নামটাই উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া যায়। সার্গন ছিল খুবই হিংস্র প্রকৃতির— যে কিনা নিজের ভালো ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। সে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে এবং সভ্যতার অনেক নিদর্শনকে ধ্বংস করে ফেলে। শুধু হত্যা বা ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হতো না। সে যে অন্যায়গুলো করত, সেগুলো আবার শক্ত মাটির ওপর খোদাই করে লিখে রাখত। তার একটি নীতি যা বহু বছর পর খোদাই করা অবস্থাতেই পাওয়া যায়, তাতে লেখা ছিল, ‘এই ব্যক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, আমি তাকে হত্যা করে ফেলেছি। আমার বিপরীতে যে-ই দাঁড়াবে, আমি তাকেই হত্যা করব’।

সার্গন তার সেনাবাহিনীকে এতটা দক্ষিণে প্রেরণ করেছিল যেন তারা সাগরের দেখা পায় এবং সেই সাগরের পানিতেই তারা নিজেদের রক্ত মাখা তরবারি ধুয়ে ফেলতে পারে। সেই পর্যন্ত পৌঁছে তিনি লিখেছিলেন, ‘যে রাজা এরপরও আমার সমকক্ষ হিসেবে দাবি করবে, তাকে এই সাগরেই যেতে হবে।’ তিনি আরও দাবি করেছিলেন, ‘আমি যতটা এলাকা জয় করেছি, এখন পর্যন্ত কেউ এত বেশি এলাকা জয় করতে বা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি।’ আজকের বাস্তবতায় অবশ্য তার এলাকা খুব বড়ো ছিল না। হয়তো পরিমাপ করলে এখনকার নিউ জার্সির তুলনায় ক্ষুদ্রই হবে।

সে সময়ই নতুন আরেক জাতি এসে আক্কাদিয়দের জয় করে। এরপর আরেক জাতি, তারপর আরেকটা। এভাবেই গুটিয়ান, ক্যাসিটেস, হুরিয়ানস এবং তারও পরে অ্যামোরীয়রা। এই ধারা যেন চলতেই থাকে। একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, যতই নতুন শাসকের আবির্ভাব ঘটুক না কেন, মূলত তারা একই এলাকায় শাসন চালাচ্ছিল। হয়তো আগের শাসকের তুলনায় এলাকার পরিধি একটু বাড়িয়েছে, এর বেশি কিছু নয়।

অ্যামোরীয়রা অন্যদের তুলনায় একটু আলাদাভাবে স্বীকৃতি পায়। কারণ, তারা ব্যাবিলনের প্রসিদ্ধ শহরটি নির্মাণ করেছিল এবং সেই শহর থেকেই তারা প্রথম ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যাবিলনীয়দের থেকে ক্ষমতা চলে যায় অ্যাসেরীয়দের হাতে, যারা আরও বড়ো এলাকায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং নিনেভেহ-এর মতো বড়ো একটি শহরও বিনির্মাণ করেছিল। তাদের সাম্রাজ্য ছিল ইরাক থেকে শুরু করে মিসর পর্যন্ত। আর সেই আমলের কথা বিবেচনা করলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, কত বড়ো ছিল সেই সাম্রাজ্য। কারণ, তখনো পর্যন্ত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার একমাত্র যানবাহন ছিল ঘোড়া। অ্যাসেরীয়রা অবশ্য ইতিহাসের পাতায় খুবই নির্মম ও স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এটা বলা কঠিন যে, সেই আমলে তারাই সবচেয়ে নির্মম জাতি ছিল কি না। তবে তারা কৌশল হিসেবে যে বর্বর নীতি গ্রহণ করেছিল, তারই ছায়া আমরা আবার দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীতে জোসেফ স্ট্যালিনের মাধ্যমে। অ্যাসেরীয়রা একটি গোটা জনগোষ্ঠীকে তাদের আবাসভূমি থেকে উৎখাত করে তাদেরকে নতুন একটি জায়গায় স্থাপন করেছিল। এই উৎখাতের পেছনে যুক্তি ছিল, যদি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে তাদের ভিটেমাটি ও পরিচিত জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা যায়, তাহলে তারা অসহায়, নেতৃত্বশূন্য ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ফলে তারা শাসকদের শত অত্যাচারের পরও তাদের বিরুদ্ধে আর বিদ্রোহ করতে পারবে না।

এই কৌশলটা সাময়িক কাজ করলেও দীর্ঘমেয়াদে সফল হয়নি। অ্যাসেরীয়রা একটা সময়ে তাদেরই অধীনস্থ ক্যালডীয়দের হাতে ধরাশায়ী হয়। তারা ব্যাবিলনকে নতুন করে নির্মাণ করে এবং এই স্থানকে ইতিহাসের একটি অনন্য সাধারণ স্থানে পরিণত করে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে মহাকাশ বিদ্যা, মেডিসিন এবং গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতা ছিল। আমরা যেমন এখন ১০টি ডিজিট দিয়ে সকল হিসেব গণনা করি, তারা তখন ১২টি ডিজিট দিয়ে গণনা করত।

তারা পরিমাপ ও সময় নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিল। তাদের অবদানের কারণেই আমরা একটি বছরকে ১২ মাসে বিভক্ত করতে পেরেছি। এক ঘণ্টায় ৬০ মিনিট (যা ১২ এর ৫ গুণ) এবং এক মিনিটে ৬০ সেকেন্ড-এসব তাদেরই অবদান। তারা নগর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য নির্মাণে খুবই যোগ্য ছিল। ক্যালডীয় রাজাদের হাতেই ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান নির্মিত হয়, যা আজও বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

তবে এতসব গুণের বাইরে দমন-নিপীড়নের ব্যাপারে ক্যালডীয়রাও তাদের পূর্বসূরি অ্যাসিরীয়দের মতোই বর্বর নীতি অবলম্বন করেছিল। তাদের একজন রাজার নাম ছিল নেবুচাদ নেজার। তিনিই প্রথম জেরুজালেম নগরীকে ধ্বংস করে হিব্রু জনগোষ্ঠীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিলেন। ব্যাবিলনের আরেকজন ক্যালডীয় রাজা বালশাজারা। কথিত আছে যিনি কিনা একদিন নিজের প্রাসাদে খাবার খাওয়া অবস্থায় প্রাসাদের দেওয়ালে আগুনের হরফে অশরীরী হাতে একটি লেখা দেখেছিলেন।

সেখানে আদি হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল ‘মেনে মেনে টেকেল আপহারিসিন’; অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায় ‘ঈশ্বর নিজ হাতে বালশাজারের রাজ্য ধ্বংস করেছেন।’ ওল্ড টেস্টামেন্টে এই লেখাকে নিয়তির অখণ্ডনীয় লিখন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বালশাজারের চাটুকারেরা যারা সবসময় তাকে ঘিরে রাখত, তারা অবশ্য এই কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝেনি। খুব সম্ভবত এর কারণ, তারা মারাত্মকভাবে মাতাল ও অন্ধবিশ্বাসী ছিল। কথাটি যে চং-এ লেখা, তারা সাধারণত ওই স্টাইলে কথা বলত না। তাই তারা এই কথাটির অর্থ বের করার জন্য সে সময়ের কারাগারে বন্দি হিব্রু ভাষা বিশেষজ্ঞ ডানিয়েলের শরণাপন্ন হলো। ডানিয়েল অর্থ বের করে জানালেন, ‘তোমাদের দিন শেষ। তোমাদের অন্যায় পরিমাপ করা হয়ে গেছে এবং তোমাদের দোষ প্রমাণিত হয়েছে। অতি শীঘ্রই তোমাদের রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়বে’। ডানিয়েলের ওল্ড টেস্টামেন্ট গল্পে এভাবেই বিষয়টা উঠে এসেছে।

বালশাজারের অবশ্য এসব ভবিষ্যদ্বাণী বা সতর্কবার্তা নিয়ে পড়ে থাকার সময় বা সুযোগ কোনোটাই ছিল না। সে এগুলোকে পাত্তাই দেয়নি। যার ফলে কিছুদিন পরই ব্যাবিলনের ওপর দিয়ে রক্ত বন্যা বয়ে যায়। এবার পার্সিয়ান ও মেডেসদের সমন্বয়ে গঠিত নতুন একটি জাতিগোষ্ঠী ব্যাবিলনকে দখল করে নেয়। এই নতুন করে উঠে আসা জাতিটি ভারতীয় ও ইউরোপীয় অঞ্চলের বংশোদ্ভূত। তারা দ্বিতীয়বারের মতো ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে পার্সিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

এই পর্যায়ে এসে মধ্য পৃথিবীতে সাম্রাজ্য দখল বা প্রতিষ্ঠার লড়াই কিছুটা স্তিমিত হয়। যেন এক সাময়িক বিরতি। এর একটা কারণ এমন হতে পারে, পারস্য সাম্রাজ্যের আর কোনো নতুন জাতিগোষ্ঠী জয় করার বাকি ছিল না। আবার পারস্য সাম্রাজ্যকে জয়ের মতো এতটা শক্তিও কারও ছিল না। মিসর ও মেসোপটেমিয়া দুটো বৃহৎ সভ্যতাই পারস্যদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এর পাশাপাশি তাদের সাম্রাজ্য পশ্চিমে এশিয়া মাইনর, দক্ষিণে নীল নদ এবং পূর্বে ইরানীয় পর্বতশৃঙ্গ, আফগানিস্তান এবং ইন্দুস (সিন্দু) নদী পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। সুসভ্য এবং অভিজাত পারস্য সম্প্রদায় আর কোনো নতুন অঞ্চল জয় করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি। কারণ, ইন্দুস (সিন্দু) নদীর দক্ষিণে কালো জঙ্গল ছাড়া আর কোনো এলাকা বাকি ছিল না। আফগানিস্তানের উত্তরের আবহাওয়া ছিল খুবই বৈরী। সেখানে মানুষ বলতে তুর্কি কিছু যাযাবর ছিল, যারা চিন্তা-চেতনায় ছিল খুবই আদিম ও পশ্চাৎপদ। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কোনো খায়েশ পারসিয়ানদের মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই নতুন কোনো সীমানা না বাড়িয়ে পারসিয়ানরা নিজেদের সাম্রাজ্য মজবুত ও নিরাপদ করার দিকে মনোযোগ দেয়। তারা নতুন করে অনেকগুলো দুর্গ বানায়, যেন অন্য কোনো বর্বর জাতি সহজে তাদের এলাকায় আক্রমণ করতে না পারে। তারা নগরীর সভ্য মানুষগুলোর নিরাপত্তা এবং উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে অধিক মনযোগী ছিল।

পারসিয়ানদের মধ্যে চেতনাগত এই পরিবর্তনগুলো আসে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ শতাব্দীর দিকে। আসলে এরই মধ্যে অধিকাংশ সাম্রাজ্যগুলো একীভূত ও পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ইলাম, উর, নিনেভেহ ও ব্যাবিলনের মতো বড়ো সাম্রাজ্যগুলো একটি একক রাজধানী করে পৃথক পৃথক রাজ্য তৈরি করে ফেলেছিল এবং আশেপাশের অন্য সকল উপজাতি বা নৃগোষ্ঠীকে একটি একক শাসন পদ্ধতির আওতায় নিয়ে এসেছিল। বলা বাহুল্য, পারস্যরা তাদের পূর্বসূরিদের রক্তপাত, বর্বরতা ও জবরদখলের সংস্কৃতি থেকেও যথেষ্ট শিক্ষা নিয়েছিল। তাই তারা পুরোনো সেই কৌশল প্রয়োগ করতে আর তেমন একটা আগ্রহী হয়নি।

এর পাশাপাশি পারস্য সাম্রাজ্যটি টিকে যাওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণও ছিল। প্রথমত, পারস্যরা চিন্তা-চেতনায় অ্যাসেরীয়দের পুরোই বিপরীত ছিল। তারা শাসন কাজ পরিচালনায় অ্যাসেরীয়দের তুলনায় ভিন্ন একটি কৌশল অবলম্বন করেছিল। একটি ভিন্ন মতাবলম্বী জাতিগোষ্ঠীকে সমূলে উচ্ছেদ করার পুরোনো কৌশলে না গিয়ে পারসিয়ানরা বরং তাদের নতুন করে পুনর্বাসিত করেছিল। তারা হিব্রুদেরকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রকাশ্য জনপদে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। পারসিয়ান শাসকরা মূলত বহু সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। অর্থাৎ বিভিন্ন স্বভাব ও সংস্কৃতির মানুষরা যেন একইসঙ্গে একটি রাষ্ট্রে থাকতে পারে, তারা সেই ব্যবস্থা করেছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকলেও তারা তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আচারাদি পারসিয়ানদের শাসনামলে নির্বিঘ্নে পালন করতে পারত। এভাবে বিশাল একটি এলাকা পারসিয়ানরা সফলতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতি জনপদে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার শাসক ছিল এবং যত ধরনের রাজস্ব ছিল, সব তারা স্থানীয় জনপদেই প্রদান করত।

সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে তাদের কাছে যে চাহিদা দেওয়া হতো, তা অতীতের তুলনায় ছিল খুবই সামান্য। পরবর্তী সময়ে ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমান শাসকরা পারসিয়ানদের এসব নীতির অনেকগুলোই গ্রহণ করেছিল, যা অটোমান সাম্রাজ্যের সময় পর্যন্ত নানাভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পারসিয়ানরা বুঝতে পেরেছিল তাদের রাষ্ট্রকে যদি সঠিকভাবে চালাতে হয়, সকল জনগোষ্ঠীকে যদি ভালোমতো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, একত্রে রাখতে হয়, তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো করতে হবে। তারা রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়াকে আমূল সংস্কার করে এবং একক মুদ্রা চালু করে। তারা উপলব্ধি করেছিল মুদ্রাই হলো বাণিজ্যিক যোগাযোগের মূল হাতিয়ার। তারা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল উন্নয়ন করে এবং সড়কের পাশে থাকার হোটেল নির্মাণ করে, যেন ভ্রমণগুলো সহজ ও আনন্দদায়ক হয়। তারা ডাক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন করে। তাদের ডাক যোগাযোগের নীতি ছিল, আজকের মার্কিন পোস্টাল সার্ভিসের মতোই কর্মতৎপর ও সেবানির্ভর। যত রাতই হোক, যত খারাপ আবহাওয়া হোক না কেন, সময়মতো গ্রাহককে তার জিনিস পৌঁছে দেওয়াটাই ছিল ডাক কর্তৃপক্ষের মূল চ্যালেঞ্জ।

পারসিয়ান কর্তৃপক্ষ অসংখ্য অনুবাদককেও নিয়োগ দিয়েছিল। এমন অবস্থা তারা তৈরি করেছিল, যেন একজন আগন্তুকও তাদের রাজ্যে এসে পারস্য ভাষা না জানার কারণে সমস্যায় না পড়ে। যেহেতু পারস্য সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ভাষার বহু লোক বসবাস করত, তাই এসব অনুবাদকরা পারস্য শাসনামলের নানা সাফল্যগাঁথাও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করত। যেন অধীনস্থ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের শাসকদের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড জানতে পারে। যেমন : পারস্য শাসক মহান দারিয়াসের কথা বলা যায়। তিনি বেহিস্তুন নামক একটি পাহাড়ে নিজের জীবনালেখ্য পুরোনো পারসিয়ান, এলামিটে এবং ব্যাবিলনিয়ান ভাষায় খোদাই করে লিখে রেখেছিলেন। একইসঙ্গে তিনি তার বিরুদ্ধে করা বিদ্রোহীদের দেওয়া শাস্তির কথাও সেখানে লিখেছিলেন, যেন ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিদ্রোহীরা বুঝতে পারে শাসকের সাথে অন্যায় করলে তাদের কী শাস্তি পেতে হতে পারে। তবে সার্বিকভাবে নাগরিকেরা পারস্য শাসকদের দয়ালু ও মানবতাবাদী মনে করত। কারণ, তাদের শাসকরা তাদেরকে শাস্তিতে রেখেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক যাযাবর ও বখাটেরাও আজীবনে কাজ ছেড়ে সংসার পেতেছিলেন এবং কৃষিকাজের মতো উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।

বেহিস্তুনে রাজা দারিয়াস যা লিখে গেছেন, তা পুরোনো পারসিয়ান ভাষায় লেখা। বর্তমান পারসিয়ান ভাষা দিয়েও তার অর্থ বের করা যায়। ১৯ শতাব্দীতে এগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর পারসিয়ান ভাষা ব্যবহার করেই অন্য দুই প্রাচীন ভাষার (এলামিটে এবং ব্যাবিলনীয়) অর্থ বের করা সম্ভব হয়। এই দুই ভাষার অর্থ জানার সাথে সাথে পুরোনো মেসোপটেমিয়া সাম্রাজ্যের একটি অজানা ভাঙার আমাদের সামনে খুলে যায়। ওই সময়ে দিনলিপি আকারে সব সংরক্ষণ রাখার বিধান ও পদ্ধতি ছিল। তাই প্রাচীন ওই ভাষাদ্বয় জানতে পারার পর থেকে আমরা এখন ইউরোপ-আমেরিকার ১২শ বছর আগের ইতিহাস জানতে পারছি, ঠিক তেমনিভাবে ৩০০০ বছর পূর্বের মেসোপটেমিয়া সভ্যতার কাহিনি ততটাই ভালোভাবে জানতে পেরেছি।

একটা সময়ে এসে পারস্য সাম্রাজ্যে ধর্ম প্রবেশ করে। তবে তা হাজারো দেবতাকে পূজা করা হিন্দু ধর্ম নয়। মিসরীয়দের অর্ধ-মানব আর অর্ধ-পশু আকৃতির পূজনীয় দেবতারও ধর্ম নয়। গ্রিকদের প্রচলিত অগ্নিপূজাও নয়। পারস্য সাম্রাজ্যে যে ধর্মচর্চা প্রবেশ করে, তা হলো জরথুষ্টের। এই জরথুষ্ট এসেছিলেন যিশুখ্রিষ্টের জন্মেরও প্রায় হাজার বছর পূর্বে। তার সম্পর্কে খুব নিশ্চিত করে জানা যায় না। তিনি খুব সম্ভবত উত্তর ইরান বা উত্তর আফগানিস্তান কিংবা তারও পূর্বদিকে কোনো স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জরথুষ্ট নিজেকে কখনো নবি বা স্বর্গীয় শক্তির ধারক-বাহক হিসেবে দাবি করেননি। দেবতা দাবি করার তো প্রশ্নই আসে না। তিনি মূলত নিজেকে একজন দার্শনিক ও সত্যসন্ধানী দাবি করতেন। কিন্তু তার অনুসারীরা বরাবরই তাকে একজন পবিত্র মানুষ হিসেবে গণ্য করতেন।

জরথুষ্ট প্রচার করতেন, এই মহাবিশ্ব মূলত সর্বক্ষেত্রেই দুটো ভাগে বিভক্ত। একটি হলো অন্ধকার আর একটি আলো। একটি ভালো আর একটি মন্দ। একটি সত্য আরেকটি মিথ্যা কিংবা একটি জীবন আরেকটি মৃত্যু। সৃষ্টির একেবারে শুরুতেই এই মহাবিশ্বকে এভাবে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে এবং তখন থেকেই এই দুটো ধারা একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। আর এই দুয়ের মধ্যে চলমান সংঘাত চলবে একেবারে মহাবিশ্বের শেষ দিন পর্যন্ত।

জরথুষ্ট আরও বলেন, মানুষের মধ্যেও এই দুটো বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। কোন পথে সে হাঁটবে, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন। ভালোর দিকে এগিয়ে গেলে মানুষ আলো ও জীবনের পথে হাঁটতে শুরু করে। আর খারাপ পথে এগোলে অন্ধকার ও মৃত্যুর পক্ষশক্তি আরও মজবুত হয়। জরথুষ্টের মতে, কোনো কিছুই আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে না। অর্থাৎ নিয়তি বলে কিছু আছে, এটা তিনি মনে করতেন না। আর ভালো-মন্দের লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে, তা নিয়ে তিনি সংশয়ে ছিলেন। তিনি মনে করতেন, মানুষের নৈতিক পথ বাছাই করে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি নৈতিক পথ ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত পরিণতিতে প্রভাব ফেলে।

জরথুষ্ট দাবি করেন, এই বিশ্ব নাটকের মূল চরিত্র দুটো। আহুরা মাজেদা নামের একটি চরিত্র আছে, যা আসলে ভালোর প্রতিবিশ্ব আর আহরিমান হলো খারাপের প্রতিচ্ছবি। আগুন হলো আহুরা মাজেদার একটি রূপায়ণ। তাই আগুনকে তিনি ভিন্নভাবে বিবেচনা করতেন। এ কারণেই অনেকেই জরথুষ্টকে অগ্নিপূজারী মনে করেন। আসলে তারা আগুনকে পূজা করত না। আগুনকে সামনে রেখে তার পূজা করত আহুরা মাজেদাকে। জরথুষ্ট অবশ্য একটি পরকালের কথাও বলতেন। তিনি বলতেন, কেবল ভালো মানুষগুলোই সেখানে যাবে। তবে পুরস্কার হিসেবে নয়; বরং তারা যে সঠিক পথটি বেছে নিয়েছে, তার সফল পরিণতি হিসেবেই তারা সেখানে পৌঁছবে। অর্থাৎ, ভালো পথ বেছে নেওয়ার কারণে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে স্বর্গে উন্নীত করবে। পারস্য জরথুষ্টবাদীরা সব ধরনের ধর্মীয় মূর্তি, প্রতীকী ছবি বা প্রতীককে প্রত্যাখ্যান করে। এই একই ধরনের চেতনা ইসলামি দর্শনেও আমরা দেখতে পাই।

অনেক সময় জরথুষ্ট্র এবং তার কিছু কিছু অনুসারীদের কাছ থেকে আমরা এমনও শুনতে পাই, তারা আহুরা মাজেদাকে ‘জ্ঞানী প্রভু’ হিসেবে সম্বোধন করছেন। তারা আহুরা মাজেদাকে গোটা মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। তাদের মতে, মহাবিশ্বের সৃষ্টির অল্প কিছু সময় পরে আহুরা মাজেদা সবকিছুকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেছেন। বলা যায়, পুরোনো পারস্য সাম্রাজ্যের জরথুষ্ট্র মতবাদ অনুযায়ী দুটো দেবতা সমান ধরনের শক্তি নিয়ে এই মহাবিশ্বে বিরাজ করছেন। অন্যদিকে, মানুষ তাদের হাতে থাকা সুতোয় আটকে থাকে আর জীবনভর এই দুই সত্তার মধ্যে কার দিকে ঝুঁকবে— এটা নিয়েই লড়াই চালিয়ে যায়।

জরথুষ্ট্র যুগে পারস্যে একজন ধর্মযাজক ছিলেন, যার নাম মাণ্ডস। খ্রিষ্টান ধর্ম অনুযায়ী শিশু যিশু যখন একাকী ঘোড়ার আস্তাবলে পড়েছিলেন, তখন পূর্ব থেকে আসা তিনজন জ্ঞানী লোক যিশুর জন্য লকান ও গন্ধরস নিয়ে আসেন। আসলে ওই তিনজন ছিলেন জরথুষ্ট্র ধর্মযাজক। বর্তমানে আমরা যে ম্যাজিশিয়ান শব্দটি ব্যবহার করি, তাও এসেছে ওই মাণ্ডস (বহুবচন হলো ম্যাজাই) থেকে। অনেকেই মনে করেন, ওই তিন ধর্মযাজকের অলৌকিক ক্ষমতাও ছিল।

পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ দিকে তারা কিছু কর্মকাণ্ড করে যার উল্লেখ পশ্চিমা বিশ্ব ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যায়। পারস্যের রাজা দারিয়াস এক সময় গ্রিকদেরকে শাস্তি দিতে চাইলেন। লক্ষ্য করবেন, আমি ‘শাস্তি দেওয়া’ শব্দটি ব্যবহার করেছি; অভিযান বা দখল এসব শব্দ নয়। কারণ, পারস্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা ভিন্ন কোনো জাতি বা সভ্যতার সাথে গতানুগতিক সংঘাতে বিশ্বাস করতেন না। পারস্যের রাজা মনে করত, গ্রিকরা হলো পশ্চিমের ছোটো ছোটো শহরের আদিম বাসিন্দা। যারা অল্প হলেও সভ্যতার ঘ্রাণ পেয়েছে। পারস্যের রাজা এটাও মনে করত ওই শহরগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। যদিও এতটা দূর থেকে ওই এলাকাগুলো সরাসরি শাসন করার কোনো উপায় ছিল না। যাহোক, পারস্য রাজা দারিয়াস একবার গ্রিকদের বশে আনার জন্য তাদের কাছে বার্তাবাহককে দিয়ে এক জার পানি এবং এক বাক্স মাটি পাঠালেন। এটা ছিল প্রতীকী উপহার যা গ্রহণ করলে বোঝা যাবে যে, গ্রিকরাও পারস্যদের অধীনে থাকতে রাজি আছে। কিন্তু গ্রিকরা সেই প্রতীকী উপহার প্রত্যাখ্যান করল। এতে দারিয়াস প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তিনি বিরাট সেনাদল জোগাড় করলেন। উদ্দেশ্য গ্রিকদেরকে এমন শিক্ষা দেওয়া, যেন ওরা কোনো দিন আর না ভুলে যায়। কিন্তু বিশাল সাইজের সেই সেনাদল আসলে দারিয়াসের জন্য যতটা না সম্পদ ছিল, তার থেকে বেশি ছিল বোঝা। কীভাবে এত বিশাল সংখ্যক একটি বাহিনীকে এত দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? কীভাবেই বা পরিচালনা করা সম্ভব? কীভাবে তাদেরকে রসদ সরবরাহ করা যাবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কঠিন ছিল। আগের পারস্যদের যুদ্ধনীতি ছিল, ইউরোপে কখনোই স্থল বাহিনী দিয়ে আক্রমণ করা যাবে না। দারিয়াস সেই নীতিও অগ্রাহ্য করলেন। পরিণতিতে যা হওয়ার তাই হলো। পারস্যের গ্রিকদের কী শিক্ষা দেবে; উলটো গ্রিকরাই পারস্যদের এমন শিক্ষা দিলো, যা তাদের আজীবন মনে থাকার কথা। যদিও পারস্যের খুব বেশি দিন তা মনে রাখেনি।

এক প্রজন্ম পরেই দারিয়াসের নির্বোধ সন্তান জার্জিস আবারও বাবার মতো ভুল কৌশল অবলম্বন করে বাবার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে গ্রিসে অভিযান চালায়। কিন্তু সেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে আর এভাবেই পারস্যদের ইউরোপ জয়ের স্বপ্নময় অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তবে এরপরও বিষয়টার চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেনি। ১৫০ বছর পর আলেকজান্ডার দি গ্রেট ভিন্নভাবে এই যুদ্ধের সমাপ্তি টানেন। আমরা প্রায়শই শুনতে পাই যে, মহাবীর আলেকজান্ডার বিশ্বজয় করেছিলেন। আসলে তিনি জয় করেছিলেন শুধু পারস্য সাম্রাজ্য আর তখন পারস্য সাম্রাজ্যকেই বিশ্ব মনে করা হতো। কারণ, পারস্যের নিয়ন্ত্রণেই চিরচেনা বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা সেই সময়ে পরিচালিত হতো।

আলেকজান্ডারের কারণেই ভূমধ্যসাগরীয় ইতিহাসের সবটুকুই যেন মধ্য পৃথিবীর ঘাড়ে চলে আসে। আলেকজান্ডার স্বপ্ন দেখতেন ইউরোপ ও এশিয়া— এই দুই বৃহৎ এলাকাকে এক করে ফেলার। তিনি ব্যাবিলনকে তার বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী করতে চেয়েছিলেন। তার স্বপ্নের অনেকটুকুই তিনি বেশ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পারস্যের অনেক গল্প আর রূপকথাতে তাই আলেকজান্ডারের নাম পাওয়া যায়। সবসময় যে তার নাম ইতিবাচকভাবেই এসেছে তা নয়, আবার খুব যে নেতিবাচকভাবে এসেছে, তাও নয়। এমনকী পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বের অনেক শহরের নাম রাখা হয় আলেকজান্ডারের নামে। মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া হলো তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। আরেকটি ছোটো উদাহরণ হলো কান্দাহার শহর, যেটিও আলেকজান্ডারের নামানুসারে নামকরণ করা হয়। তালেবানরা আফগান দখল করার পর এই কান্দাহার বিশ্ববাসীর সামনে পরিচিত হয়ে ওঠে। কান্দাহারকে আসলে ডাকা হতো ইসকান্দার বলে। ইসকান্দার হলো আলেকজান্ডার। উল্লেখ্য, প্রাচ্যের দেশগুলোতে আলেকজান্ডারকে ইসকান্দারই বলা হয়। কালানুক্রমে ইসকান্দার থেকে ইস্টা বাদ পড়ে যায়। আর কান্দারকে আরেকটু পরিশীলিত ভাষায় নামকরণ করা হয়, কান্দাহার।

কিন্তু এত কিছুই পরও শেষ রক্ষা হয়নি। এশিয়াকে নিয়ে আলেকজান্ডার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা মাত্র এগারো বছরের মাথায় এসে শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ করেই একরাতে তিনি ব্যাবিলন নগরীতে থাকা অবস্থায় মারা যান। তার কি কোনো ফু হয়েছিল, নাকি ম্যালেরিয়া, নাকি অতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলেন, নাকি কেউ বিষ খাইয়েছিল—এগুলো নিয়ে কোনো সঠিক তথ্য জানা যায় না। আলেকজান্ডার যেসব এলাকা জয় করেছিলেন, তিনি তাঁর সব কয়টা এলাকাই পরিচালনা করার জন্য জেনারেল নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এসব এলাকায় অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এলো। এমনকী তাদের বোধ ও ধর্ম বিশ্বাসেও বিস্ময়কর পরিবর্তন এলো। পাশাপাশি তাদের চিত্রকলা, শিল্পকর্ম এবং নান্দনিক কাজকর্মেও ব্যাপক বিবর্তন ঘটল। অনেকেই আবার চেতনার জায়গা থেকে অনেকটা গ্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে চলে গেল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরপরই তার অধীনস্থ বাকট্রিয়া রাজ্যে (আজকের উত্তর আফগানিস্তান)

স্থানীয় শিল্পীরা গ্রিক দেবীর আদলে মূর্তি বানাতে শুরু করেন। আরও কিছুকাল পরে উত্তরের ভারতীয় অঞ্চল থেকে সেখানে যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব আসতে শুরু করে, তখন গ্রিক আর বৌদ্ধ উভয় চেতনাকে মিশ্রণ করে নতুন ধারার এক শিল্পকর্ম উদ্ভাবন করা হয়। যাকে এখন গ্রিসো-বুদ্ধিস্ট আর্ট হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ধীরে ধীরে এই শাসন ব্যবস্থাটিও দুর্বল হয়ে যায়। গ্রিকদের প্রভাব কমতে শুরু করে। তাদের আধিপত্য কমে যায় এবং পারসিয়ান ভাষা আবার সামনে চলে আসে। এরপর আরেকটি জাতিগোষ্ঠী প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যটি ফের দখল করে। নতুন এই জাতিগোষ্ঠীর নাম ছিল পারথিয়ানস। এরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধার জাত। এই পারথিয়ানরা রোমান সাম্রাজ্যকে পর্যন্ত স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে এই পারথিয়ানদের কারণে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের গতিও এক রকম থেমে গিয়েছিল। পারথিয়ান সেনারা বিশ্ব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্যাটাফ্রাক্ট ব্যবহার করে। ক্যাটাফ্রাক্ট হলো সেসব নাইটরা (বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি), যারা সম্পূর্ণ মেটাল নির্মিত বর্ম পরিধান করত আর তাদের ঘোড়াগুলোকেও একই ধরনের লোহার বর্ম পরানো হতো। ইউরোপের সামন্ত যুগে নাইটদের আমরা এই ধরনের পোশাক পরিধান করতে দেখি। পারথিয়ান সেই নাইটরা ছিলেন চলমান দুর্গের মতো। তাদের পরাজিত করা দুর্গ জয়ের মতো কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু ওজনে বেশি ভারী হওয়ায় পারথিয়ানরা যুদ্ধের ময়দানে হালকা ওজনের বর্মবিহীন অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে যেত। যুদ্ধের ডামাডোলে কৌশল হিসেবে হালকা ওজনের এই ঘোড়াগুলো নিয়ে অশ্বারোহীরা পালিয়ে যেত। প্রতিপক্ষের সৈন্যরা ভাবত বোধ হয় পারথিয়ানরা পরাজিত হয়ে গিয়েছে, তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। ফলে তারা তাদের ধাওয়া করত এবং চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দেওয়ার নেশায় নিজেরাই দিগবিদিক ছুটোছুটি করত। তখনই পারথিয়ানরা ঘোড়ার চাকা আবার ঘুরিয়ে দিত শত্রুপক্ষের দিকেই। সঙ্গে যোগ হতো শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যুহ ক্যাটাফ্রাক্ট। ফলে খুব সহজেই প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারত এই পারথিয়ান যোদ্ধারা। এই কৌশলটি ইতিহাসে ‘পারথিয়ান শট’ হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

পারথিয়ানরা পারস্যের উত্তর প্রান্ত থেকে আসা সম্প্রদায় যারা উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় শিকারের কাজে পারদর্শী ছিল। কিন্তু যখন তারা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে নিতে সক্ষম হলো, তখন তারা নিজেদেরকে ‘পারথিয়ান’ নামে নামকরণ করল। সম্ভবত পারথিয়ান হলো পারসিয়ান নামেরই আরেকটি রূপায়ণ। পারথিয়ানদের সাম্রাজ্য খুব সম্ভবত এক শতাব্দী টিকে ছিল। তবে তাদের কীর্তিকর্ম খুব একটা জানা যায় না। কারণ, শিল্প ও সংস্কৃতির বিষয়ে তাদের তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। ফলে তাদের কোনো ইতিহাসও সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। আর মেটাল ঘোড়ার ভেতর যারা থাকত, তারা সাধারণত সেখান থেকে তেমন একটা বের হতো না। ফলে ধাতুর প্রতিক্রিয়ায় তাদের শরীরেও নানা রোগব্যাধি হতো, যার কারণে অনেকেই বেশি দীর্ঘ আয়ু পায়নি।

যতদিন তারা ক্ষমতায় ছিল, পার্থিয়ানরা ব্যবসায় খুব মনোযোগ দিয়েছিল। তারা তাদের বাণিজ্যিক ক্যারাভানগুলোকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে তারা তাদের সাম্রাজ্যের ভেতরে নিরাপদে ও অবাধে যাতায়াত করতে পারত। পার্থিয়ানদের রাজধানীর নাম ছিল হেকাটোমপিলস। যা মূলত একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ ‘শত দরজা’। এই নাম দেওয়ার কারণ ছিল পার্থিয়ানদের রাজধানী আসলে এমন জায়গায় এবং এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল, যেখানে অসংখ্য সড়ক একসঙ্গে এসে মিশেছিল। পার্থিয়ানদের বাজারে গেলে সম্ভবত আশেপাশের অন্যসব সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের খবরও পাওয়া যেত। এই পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের পূর্বে ছিল গ্রিসো-বুদ্ধিস্ট রাজ্য, হিন্দু রাজ্য ছিল দক্ষিণে, চীন ছিল একেবারে পূর্বে, পশ্চিমে ছিল গ্রিক (সেলুসিড) রাজ্য আর উত্তরে ছিল আর্মেনিয়ানরা। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া পার্থিয়ানদের সঙ্গে রোমানদের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। পারস্য থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে তারা সভ্যতার যে ধারাবাহিকতা পেয়েছিল, তা তারা সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। ফলে ভূমধ্যসাগরীয় আর মধ্য পৃথিবী যেটা আলেকজান্ডারের সময় এক হয়েছিল, তা পার্থিয়ানদের সময়ে এসে আবার বিভক্ত হয়ে যায়।

অন্যদিকে, পার্থিয়ানদের উত্থানের সময়ই চিনারা প্রথমবারের মতো একীভূত হয়। চিনের গৌরবময় ও বর্ণাঢ্য হান রাজবংশের সোনালি সময় আর পার্থিয়ানদের যুগ মূলত একই সময়ে ইতিহাসে আবির্ভূত হয়। তা ছাড়া পার্থিয়ান যুগের একেবারে গোড়ার দিকেই পশ্চিমে থাকা রোমানরাও তাদের সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম হয়। রোমানরা যখন প্রথমবারের মতো কার্থেজকে জয় করে, পার্থিয়ানরাও তখনই ব্যাবিলন নগরী জয় করে। অর্থাৎ জুলিয়াস সিজার যখন গলকে পরাভূত করে, ঠিক সেই সময়গুলোতেই পার্থিয়ানরাও মধ্য পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ পায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩ শতকে পার্থিয়ানরা রোমানদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে। যুদ্ধে বিজয়ের ফলে তারা সাড়ে ৩৪ হাজারের বিশাল সেনাদলের নিয়ন্ত্রণ পায়। একইসঙ্গে তারা রোমান বীর ক্রসাসকেও হত্যা করে। এই ক্রসাস একসময় জুলিয়াস সিজার ও পম্পেই-এর সঙ্গে মিলে রোমকে শাসন করেছিলেন।

৩০ বছর পরে পার্থিয়ানরা মার্ক অ্যান্টনি নামে একজন বীর যোদ্ধার কাছে মর্মান্তিকভাবে পরাজিত হয়। এরপর বাধ্য হয়ে তারা ইউফ্রেটিস নদীকে কেন্দ্র করে একটি সীমানা তৈরি করে যা মূলত দুইটি সাম্রাজ্যকে (রোমান ও পার্থিয়ান) পৃথক করে। যিশুখ্রিষ্ট যখন জন্ম নেন, তখনো পার্থিয়ানরা পূর্বে তাদের রাজ্য সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখে। খ্রিষ্টানদের ব্যাপক জনপ্রিয়তাকে পার্থিয়ানরা খুব একটা পাত্তা দেয়নি। কারণ, তারা জরথুষ্ট্র মতাদর্শে বিশ্বাস করত। যখন খ্রিষ্টানরা পূর্ব দিকে তাদের সমর্থন বাড়াচ্ছিল, পার্থিয়ানরা তাতেও কোনো বাধা দেয়নি। আসলে পার্থিয়ানদের এহেন আচরণের কারণ ছিল এই যে, বাস্তবিক অর্থে তারা ধর্মে-কর্মে খুব একটা গুরুত্ব দিত না।

পার্থিয়ানরা সবসময় সামন্তপ্রথায় বিশ্বাস করত। তাদের ব্যবস্থাপনা কৌশলে বেশ কয়েক স্তরের সামন্ত জমিদারের অস্তিত্ব ছিল। একসময় রাজকীয় শক্তি এই সামন্ত প্রথাকে গ্রাস করতে ঢুকে পড়ে।

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে একটি প্রাদেশিক বিদ্রোহী দল পারথিয়ানদের শেষ শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং সাসানীয় রাজতন্ত্র নামে নতুন একটি যুগের সূচনা করে। খুব দ্রুত এই সাসানীয়রা গোটা পারথিয়ান রাজ্যকে কবজা করে নেয়। সাসানীয়রা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে খুব একটা হাত দেয়নি। তারা রাষ্ট্রকে আরেকটু কার্যকরভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। তারা গ্রিসের হেলেনিক প্রভাবকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে পারস্যিয়ান চেতনাকে আবারও প্রতিষ্ঠিত করে। তারা অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ, বড়ো বড়ো দালান এবং নতুন নতুন শহর তৈরি করে। জরথুষ্ট্রা যেন আবার প্রাণ ফিরে পায়। আবারও সেই আগুন, ছাই, সূর্যের আলো, অন্ধকার, আহুতা মাজেদা এবং আহরিমানের উপাসনা শুরু হয়। এবার জরথুষ্ট্রকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের সম্মান দেওয়া হয়। অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু মিশনারি মানসিকতা নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে আফগানিস্তান থেকে সেখানে এসেছিল। কিন্তু তারা জরথুষ্ট্র অতিরিক্ত প্রভাবসমৃদ্ধ এই এলাকায় খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। তারা পূর্বের দিকে সরে যায়, আর সে কারণেই বৌদ্ধ ধর্ম ইউরোপে না গিয়ে চীনের দিকে বেশি প্রসারিত হয়।

পারস্য ভাষায় অসংখ্য রূপকথা ও কল্পকাহিনি আছে, যা এই সাসানীয় যুগকে নিয়ে রচিত হয়েছে। সাসানীয়দের বিখ্যাত রাজা ছিলেন খুসরু আনুসেরভান। পারস্যিয়ানদের গল্পে একমাত্র রাজা হিসেবে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই ইরানের পুরোনো কীর্তিগাঁথাতে তাদের প্রথম রাজতন্ত্রের তৃতীয় রাজার নামও এই খুসরুর নামানুসারেই এসেছে; যিনি ইতিহাসে ‘কায় খসরু’ হিসেবে পরিচিত।

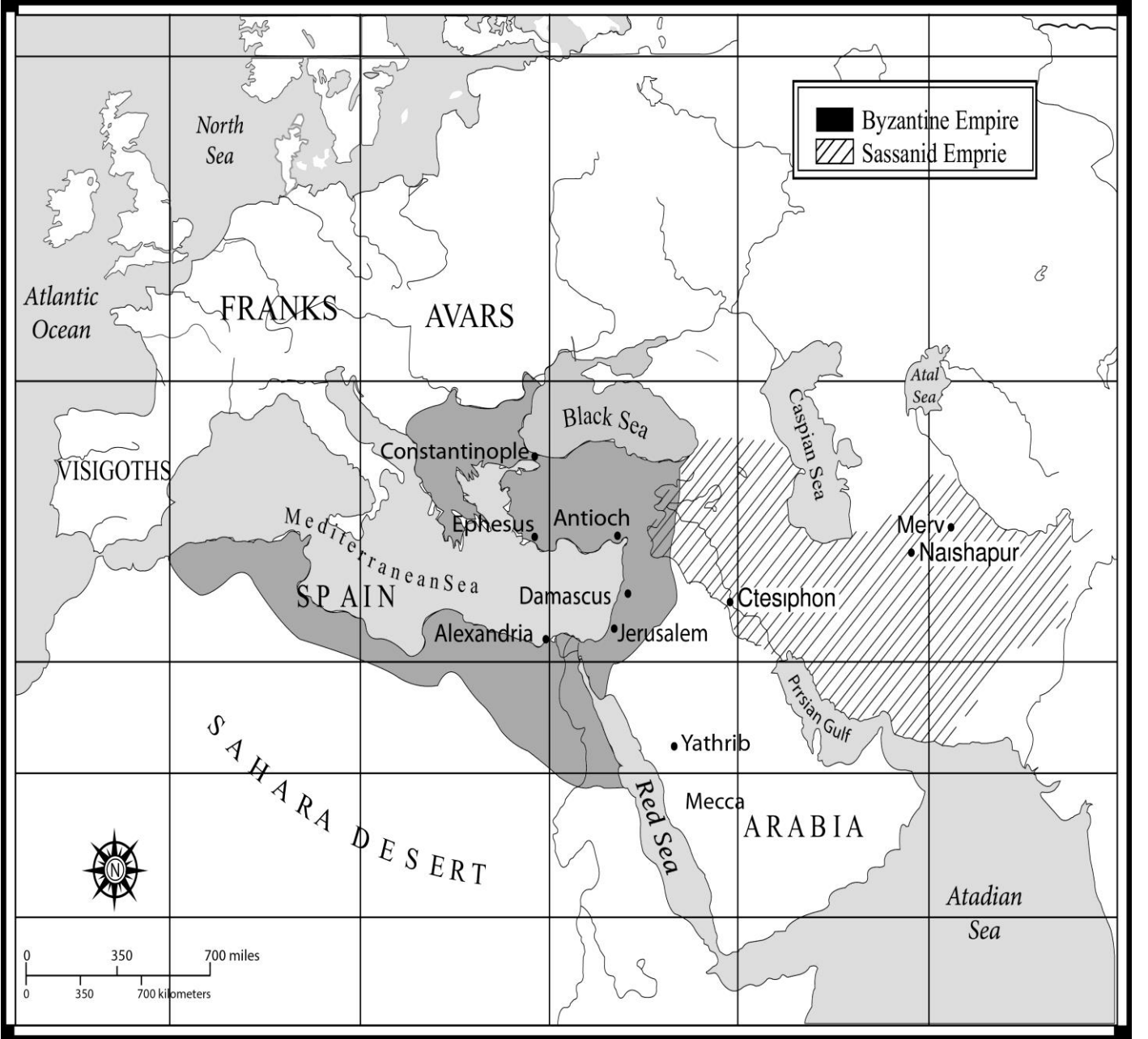
এদিকে রোমান সাম্রাজ্যও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। ২৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট ডিওক্লিটিয়ান প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে তার রাজ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। সাম্রাজ্যটি এতটাই বড়ো হয়ে গিয়েছিল যে, একটি একক কেন্দ্রস্থল থেকে শাসনকাজ পরিচালনা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ডিওক্লিটিয়ানের সেই সংস্কার উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত গোটা সাম্রাজ্যকেই দুটো পৃথক রাজ্যে বিভক্ত করে দেয়। রোমান সাম্রাজ্যের যা সম্পদ ছিল, ভাগ করার পর তার বেশিরভাগ পূর্বে পড়ে যায়। ফলে পশ্চিমাংশটি দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, জার্মান যোদ্ধারা সেই সুযোগে রাজ্যে ঢুকে পড়ায় গোটা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে পড়ে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে এবং বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। বিদ্যালয়গুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে। পশ্চিম ইউরোপীয়রা সেভাবে লেখাপড়ার সুযোগ আর পায় না। ফলে ইউরোপ অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে। জার্মানি, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনে রোমান সাম্রাজ্যের যে অংশগুলো পড়েছিল, তা ধ্বংস হয়ে যায়। সমাজও তখন তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যোদ্ধা, যাজক আর ক্রীতদাস কৃষক। কেবল খ্রিষ্টবাদ মানুষকে একত্রে বেঁধে রেখেছিল, যা নিয়ন্ত্রণ করতেন রোমের বিশপ। পরবর্তী সময়ে তাকে পোপ হিসেবে সম্বোধন করা হয়।

অন্যদিকে, রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ তখনো টিকে ছিল। তাদের কেন্দ্রস্থল ছিল কন্সট্যান্টিনোপল। স্থানীয় জনগণ তখনো এই রাজ্যকে রোমান রাজ্য বলেই ডাকত। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারা এই রাজ্যকে নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন। তারা এর নাম দেন বাইজানটাইন সাম্রাজ্য।

এখানে আদি খ্রিষ্টবাদের প্রভাব বেশি ছিল। পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের মতো এখানে কোনো পোপসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন না। প্রত্যেক শহর, যেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খ্রিষ্টান ছিল, সেগুলোকে মেট্রোপলিটান বলা হতো এবং সেখানে তাদের নিজস্ব বিশপ ছিল। প্রত্যেকটি মেট্রোপলিটান ছিল সমান মর্যাদার। যদিও কন্সট্যান্টিনোপলের শীর্ষ বিশপ ছিলেন ভিন্ন মর্যাদার। আর সবার ওপর ছিলেন রাজা নিজে। সকল ধরনের শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো এই বাইজানটাইনকে কেন্দ্র করে। এখানে লেখক ও শিল্পীরা নিয়মিত বই লিখতে থাকেন, ছবি আঁকতে থাকেন এবং অন্যান্য সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। তবে এই যে পূর্ব রোম যা কিনা বাইজানটাইন সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত, পশ্চিমা বিশ্ব ইতিহাসে এই সাম্রাজ্যও কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়নি।

অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন, বাইজানটাইন আদৌ কোনো খ্রিষ্টান রাষ্ট্র ছিল কি না। পশ্চিমারা সবাই গ্রিক দার্শনিকদের সম্বন্ধে জানেন। বিশেষ করে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল কিংবা সপোকলেস, ভার্জিল, টেসিটাস, পেরিকেলস, মেসিডনের আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার, অগাস্টাস-এর নাম জানেন। কিন্তু দেখা যায় বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ওপর দখল আছে এমন ব্যক্তির ছাড়া আর কেউ সেভাবে তিনজন বাইজানটাইন দার্শনিকের নাম বা দুজন বাইজানটাইন কবির নাম কিংবা জাস্টিনিয়ান ছাড়া আর কোনো শাসকের নামও বলতে পারে না। বাইজানটাইন সাম্রাজ্য টিকে ছিল প্রায় এক হাজার বছর। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটেছে এমন পাঁচটি ঘটনার কথাও কেউ বলতে পারে না।

প্রাচীন রোমের তুলনায় বাইজানটাইন সাম্রাজ্য তেমন আলোচিত না হলেও সেই অঞ্চলে তারা আসলে সুপার পাওয়ারই ছিল। এর কারণ ছিল তাদের কোনো শত্রু প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাদের রাজধানী ছিল কন্সট্যান্টিনোপল, যা আজ অবধি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দুর্ভেদ্য ও অজেয় শহর হিসেবে স্বীকৃত। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি এসে বাইজানটাইনরা এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ এলাকা এবং পূর্ব ইউরোপের বড়ো একটি অংশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারা একসময়ে তৎকালীন আরেকটি পরাশক্তি সাসানীয়দের বিরুদ্ধেও গর্জে ওঠে। সাসানীয়রা হিমালয়ের পাদদেশ অবধি বিরাট একটি এলাকা শাসন করত। এই দুই সাম্রাজ্যের মাঝে একটি উপত্যকা ছিল, যা নিয়ে উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলঘেঁষা এই উপত্যকায় দুই পৃথিবীর ইতিহাস একটি পর্যায়ে এসে মিলেও যায়। ফলে মাঝের এই জায়গাটি নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যকার যে দ্বন্দ্ব, তা মূলত অমীমাংসিতই থেকে যায়। অন্যদিকে, দক্ষিণে এই দুই সাম্রাজ্যের চোখের সামনেই ছিল আরব উপদ্বীপ, যেখানে স্বায়ত্তশাসিত অসংখ্য উপজাতি বসবাস করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে ঠিক এটাই ছিল মধ্য পৃথিবীর রাজনৈতিক কাঠামো।



ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে : বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্য

২

শূন্য বছর (৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষের কথা। আরব উপকূলসংলগ্ন বেশ কয়েকটি শহর তখন বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে ব্যাপক সাফল্য পায়। সেই সময়ের আরবীয় ব্যবসায়ীরা লোহিত সাগরের বন্দরগুলো থেকে নানা ধরনের পণ্য বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের মশলা, কাপড় এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্যাদি সংগ্রহ করত। তারপর মরুভূমির তপ্ত পথ পাড়ি দিয়ে সেসব পণ্য সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ নানা জায়গায় পৌঁছে দিত। এসব বণিকেরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ অর্থাৎ সকল দিকেই নিয়মিত যাতায়াত করত। ফলে তারা বিভিন্ন সাম্রাজ্যে গড়ে উঠা খ্রিষ্টীয় মতবাদ বা জরথুষ্ট্র মতবাদ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখত। আরবদের নানা গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে বেশ কিছু ইহুদি গোত্রও বসবাস করত। ফিলিস্তিন থেকে রোমানরা ইহুদিদের উচ্ছেদ করার পর তারা এসে এসব আরব্য এলাকায় বসতি গড়ে। আরব ও ইহুদিদের মধ্যে ভাষাগত মিল ছিল আর তাদের উভয়ের পূর্বপুরুষ একই ব্যক্তি। তিনি হলেন হজরত ইবরাহিম (আ.) এবং তারও আগে হজরত আদম (আ.)। আরবরা মনে করত, আরব জাতি হজরত ইবরাহিমের (আ.) সন্তান হজরত ইসমাইল (আ.) এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রী হাজারার বংশধর। আর সেই সময়গুলোকে কেন্দ্র করে যেসব উপাখ্যান রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই পুরোনো বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্টের অ্যাডাম এবং ইভ (হজরত আদম আ. ও হাওয়া), কেইন অ্যাড আবেল, নোয়াহ অ্যাড হিস আর্ক (নুহ আ. এবং তার বিখ্যাত জাহাজ), জোসেফ অ্যাড ইজিপ্ট (হজরত ইউসুফ আ. এবং মিসর), মোসেস অ্যাড দ্য ফারাও (হজরত মুসা আ. এবং ফেরাউন) উপাখ্যানে পাওয়া যায়। সবগুলোই আরবীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথেও সম্পৃক্ত; যদিও সে সময়ে অধিকাংশ আরবই ছিলেন অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী এবং বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। অন্যদিকে, ইহুদিরা ছিল একেশ্বরবাদী। এই বিশ্বাসের জায়গাটি ছাড়া বাকি সব বিষয়েই কমবেশি আরবদের সাথে ইহুদিদের মিল ছিল। বিশেষ করে জীবনযাপন ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যগুলো ছিল ব্যাপক।

এই আরব এলাকায় যেসব ইহুদিরা বসবাস করত, তারা আরবি ভাষায় কথা বলত আর তাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোও ছিল আরবদের মতোন। কিছু আরব আবার ছিল বেদুইন গোত্রের যারা মূলত মরুভূমিতে বসবাস করত। তারা ছাড়া আর সব আরবই ছিল শহুরে। শেষ নবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ সে রকমই একটি শহুরে পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন ও বড়ো হয়েছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন আরব উপত্যকার মধ্যে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন চেতনাসমৃদ্ধ শহর মক্কায়।

মক্কার অধিকাংশ মানুষ মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথেই যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাদের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক ও লাভজনক ব্যবসা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক ব্যবসা। মক্কায়ে সে সময় এমন অনেক উপাসনালয় ছিল, যেখানে শত শত প্রসিদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল হুবাল, মানাত, লাত, উজ্জা। আশেপাশের সকল জায়গা থেকে প্রতিদিন শত শত মূর্তিপূজারী এসব দেব-দেবীর মূর্তি দেখার জন্য এবং ধর্মীয় আচারাদি পালন করার জন্য মক্কায়ে আসতেন। একইসঙ্গে তারা মক্কায়ে কিছুটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়েও আসতেন। অর্থাৎ উপাসনাও হলো আবার সঙ্গে যদি কিছু বেচা-কেনা করে লাভ করা যায়— তাদের এমনই উদ্দেশ্য ছিল। অন্যদিকে, এই ধর্মীয় বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মক্কার লোকেরাও যথেষ্ট ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করত। মক্কা ছিল মূলত সেই সময়ের ব্যস্ততম পর্যটন ও বাণিজ্যিক শহর। আর মক্কার বাসিন্দারা নানা ধরনের সরাইখানা, দোকান ও আগত তীর্থযাত্রীদের সেবাসংক্রান্ত বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করত।

হজরত মুহাম্মাদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে (ভিন্নমতও আছে)। তার জন্মের সঠিক ইংরেজি তারিখ জানা যায় না। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান। তিনি খুব একটা স্বচ্ছল অবস্থায় পরিবারকে রেখে যেতে পারেননি। হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মা মারা যান। তিনি জন্মেছিলেন তৎকালীন মক্কার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশে। কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র গোত্র ছিল বনু হাশিম। এই গোত্রেই অনেকটা ইয়াতিমের পরিচয় নিয়েই মুহাম্মাদ ﷺ বড়ো হতে থাকেন। তবে তিনি একেবারে পরিত্যক্ত ছিলেন না। তাঁর মাতা-পিতা না থাকলেও পরিবারের অন্যান্য নিকটাত্মীয় তাকে আন্তরিকভাবে দেখভাল করতে থাকেন। প্রথমে তিনি বড়ো হন দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে, দাদার ইন্তেকালের পর চাচা আবু তালিবের কাছে। আবু তালিব তাঁকে নিজের সন্তানের মতোই আদর করতেন। বাইরের সমাজে তাঁর খুব একটা চলাফেরার সুযোগ ছিল না। আবু তালিবের ঘরের চৌহদ্দির বাইরে তাঁকে সবাই ইয়াতিম হিসেবেই অবহেলা করত। এই কারণেই ছোটবেলা থেকেই তার ভেতরে ইয়াতিম এবং বিধবাদের জন্য একটু ভিন্ন ধরনের সহানুভূতি ও দরদ তৈরি হয়।

হজরত মুহাম্মাদ ﷺ যখন পঁচিশ বছরে পৌঁছলেন, তখন খাদিজা নামে তৎকালীন সময়ের একজন অর্থশালী বিধবা মহিলা তার ব্যবসা দেখাশোনা এবং বাণিজ্য যাত্রা সমন্বয়ের জন্য তাঁকে নিয়োগ করেন। সে সময়ে আরব সমাজে নারীদের কোনো সম্মানজনক অবস্থানে রাখা হতো না। মহিলাদের কোনো নেতৃত্বসুলভ কাজ করার সুযোগও দেওয়া হতো না। কিন্তু খাদিজা তাঁর এই বিশাল সম্পদ পেয়েছিলেন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে। আর সেই নারী প্রতিকূল সমাজেও খুব কর্তৃত্বের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল খুবই উঁচু মানের। আর সেই কারণেই একজন নারী হয়েও গোটা একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে তিনি নিজের কাজগুলো ঠিকমতোই চালিয়ে নিতে পারতেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও অটুট বিশ্বাসের ভিত্তিতে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ আর হজরত খাদিজা (রা.) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক এতটাই ভালো ছিল, এরপর যে পঁচিশ বছর খাদিজা (রা.) জীবিত ছিলেন, পুরোটা সময়ই তাঁদের মধ্যে এই অসাধারণ হৃদয়তা বজায় ছিল। যদিও তৎকালীন আরব সমাজ

একটি বহুগামী সমাজব্যবস্থা ছিল এবং সেই সময়ে কারও পক্ষেই একজন স্ত্রী নিয়ে জীবন কাটানো বেশ অসম্ভব বিষয় ছিল। কিন্তু হজরত মুহাম্মাদ ﷺ আর খাদিজা (রা.)-এর মধ্যে আত্মিক ও ভালোবাসার বন্ধন এতটাই দৃঢ় ছিল যে, যতদিন খাদিজা জীবিত ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ আর দ্বিতীয় কোনো বিয়ে করেননি।

পরিণত বয়সে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ ব্যবসায়ী হিসেবে সাফল্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন খুবই বিশ্বস্ত এবং তাঁর আচার-ব্যবহার এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক এতটাই ভালো ছিল যে, তিনি সর্বমহলেই ব্যাপক প্রশংসা ও সম্মান লাভ করতেন। যখনই কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব-বিবাদ হতো, তার মীমাংসা করার জন্য সবাই তাঁকেই ডাকত। এত কিছু পরও যখন তিনি ৪০ বছরে পৌঁছান, তাঁর মধ্যে জীবন ও জীবনবোধ নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি হয়। যেগুলোকে আমরা এখন ইংরেজিতে ‘মিডলাইফ ক্রাইসিস’ বলে থাকি। তিনি সেই সময়ে খুবই অস্থির হয়ে জীবনের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। তিনি ভাবতেন, কেন মানুষে মানুষে এত হানাহানি ও যুদ্ধ, কেন সমাজব্যবস্থায় এত অস্বকার? কেন অপরের ক্ষতি করে নিজে বড়ো হওয়ার লিপ্সা? কেন মেয়েদের নিয়ে এত নোংরামি? কেন ইয়াতিমের অধিকার নেই? কেন মানুষ ইনসাফ পাচ্ছে না? কেন ইয়াতিমের হক নষ্ট হচ্ছে? গরিব লোকদের মুখে খাবার নেই কেন? এসব নিয়ে তিনি সবসময়ই ভাবতেন।

এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবতে এবং মনকে প্রশান্ত রাখতে তিনি মক্কার এক পাহাড়ের চূড়ায় হেরা গুহার ভেতরে ধ্যান করার একটি অভ্যাস তৈরি করেন।

তারপর একদিন তাঁর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো। একদিন হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে জিবরাইল (আ.) নামক ফেরেশতা আগমন করেন। তাঁর কাছে তিনি এসে বললেন, ‘পড়ুন।’ মুহাম্মাদ ﷺ বললেন : আমি পড়তে পারি না। তারপর তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে তাতে তিনি প্রচণ্ড কষ্ট পেলেন। তারপর তিনি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, ‘পড়ুন।’ মুহাম্মাদ ﷺ বললেন : আমি তো পড়তে পারি না। তিনি দ্বিতীয়বার মুহাম্মাদ ﷺ-কে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন তাতে তিনি অনেক কষ্ট পেলেন। এরপর তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে ছেড়ে দিয়ে বললেন : ‘পড়ুন।’ মুহাম্মাদ ﷺ এবারও বললেন : আমি তো পড়তে পারি না। এরপর তৃতীয়বার মুহাম্মাদ ﷺ-কে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন তাতে তিনি অনেক কষ্ট পেলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘আপনি পড়ুন।’

এর কিছু সময় পরেই তিনি পড়তে শুরু করলেন—

‘পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে।

পড়ুন, আর আপনার রব মহিমাম্বিত।

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।’

এই ঘটনার পর মুহাম্মাদ ﷺ যখন পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড অসুস্থতা অনুভব করছিলেন। গায়ে জ্বর ছিল, ভয়ে উত্তেজনায় তিনি রীতিমতো কাঁপছিলেন। তাঁর কাছে চিরচেনা পৃথিবী যেন অন্যরকম লাগছিল। বাড়ি ফিরে তিনি হজরত খাদিজা (রা.)-কে সব খুলে বললেন। হজরত খাদিজা (রা.) তাঁকে ভরসা দিলেন, সাহস দিলেন। তিনি আল্লাহর নবিকে ﷺ বললেন,

‘আল্লাহর কসম, কক্ষনো না। আল্লাহ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদ্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন।’

এরপরই হজরত খাদিজা (রা.) হয়ে গেলেন হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রথম অনুসারী, প্রথম মুসলমান।

প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করতেন। এরপর একটা সময় পর্যন্ত তাঁর কাছে আর কোনো ওহি এলো না। ফলে লোকজন তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা শুরু করল। কিন্তু দিন কয়েক পরে আবারও তাঁর কাছে ওহি আসা শুরু হলো।

আস্তে আস্তে তিনি তাঁর দাওয়াতি কাজের পরিধি বাড়ালেন। তিনি মক্কাবাসীকে আহ্বান করলেন—

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই)। তাঁর প্রতি তোমাদের পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে। অন্যথায় তোমরা সবাই জাহান্নামে নিষ্ক্ষিপ্ত হবে। আর আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ মানে তোমাদেরকে যিনা, মদ্যপান, বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা ছাড়তে হবে। আর গরীব-দুঃখীর প্রতি সদয় হতে হবে। তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সামষ্টিক কল্যাণকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।’

মক্কায় অনেকগুলো উপাসনালয় থাকলেও একটি বিশেষ বর্গাকৃতির উপাসনালয় ছিল, যাকে সবাই অন্য যেকোনো উপাসনালয়ের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা দিত। সেই উপাসনালয়ের কোনায় একটি মসৃণ কালো পাথর ছিল— যা অনেককাল আগে আকাশ থেকে পড়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এই উপাসনালয়ের নাম কাবা। কুরআনের বর্ণনায় জানা যায়, হজরত ইবরাহিম (আ.) তাঁর সন্তান ইসমাইল (আ.)-এর সহযোগিতা নিয়ে এই ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন এই ইবরাহিম নবির (আ.) বংশধর এবং তিনি ছোটবেলা থেকেই হজরত ইবরাহিমের (আ.) তাওহিদ সম্পর্কে জানতেন। মহানবি ﷺ তাই অনুধাবন করতেন, তিনি যে ধর্মের বাণী সবাইকে জানাচ্ছেন, তা নতুন কোনো ধর্ম নয়। বরং আদি পুরুষ হজরত ইবরাহিম (আ.)-সহ হাজারো নবি যে এক আল্লাহর পথে মানুষকে ডেকে গেছেন, তিনি তার পরম্পরায় নিয়োজিত আছেন। তাই তিনি দৃঢ় কর্তে ঘোষণা করলেন, কাবাই হলো আল্লাহর ঘর আর এটাই মক্কার পবিত্র ইবাদাতখানা।

হজরত মুহাম্মাদ ﷺ প্রচার করলেন, আল্লাহই সর্বশক্তিমান; এই মহাবিশ্বের একমাত্র অধিপতি। তাঁকে মানবিক কোনো আকৃতিতে বা নির্দিষ্ট কোনো পরিধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে, সব তাঁরই সৃষ্টি।

মক্কার তৎকালীন ব্যবসায়ী নেতারা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর এসব কথাবার্তাকে নিজেদের ব্যবসার জন্য হুমকি হিসেবে মনে করলেন। কারণ, তারা এতদিনের পুরোনো মূর্তিপূজার ধর্ম এবং তাকে কেন্দ্র করে পর্যটন ব্যবসা বেশ ভালোই চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা ভাবল, এই এক আল্লাহর বিধান যদি এখানে চালু হয় বা এক আল্লাহর অস্তিত্ব যদি তারা স্বীকার করে নেয়, তাহলে আরও যে অসংখ্য দেব-দেবী আছে, যাদেরকে দেখার জন্য প্রতি বছর হাজারো লোক মক্কা আসে, তারা তখন আর আসবে না। ফলে ব্যক্তিগতভাবে তারা দেউলিয়া হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, কাবাকে কেন্দ্র করে উপাসনা কার্যক্রম করার জন্য প্রতি বছর প্রায় এক মিলিয়নেরও (১০ লাখ) বেশি লোক মক্কা আসত। সেই সময়ের হিসেবে বিশ্বে এটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো গণজমায়েত।

শুধু ইবাদত বা উপাসনার জন্য নয়, যেসব পর্যটক মক্কা আসতেন, তাদের একটা বড়ো আত্মহের জায়গা ছিল বিনোদন। আর সেই বিনোদন মানে হলো মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি। বিভিন্ন গোত্রের ক্ষমতাধর সর্দাররা এসব বিনোদন ব্যবসা পরিচালনা করে অনেক টাকা পয়সার মালিকও হয়ে গিয়েছিল। তাই তারাও মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাদের আর্থিক প্রসারের জন্য হুমকি মনে করত। আবার যে যার মতো থাকার স্বাধীনতা পেয়েছিল; মুহাম্মাদ ﷺ-কে মানতে গেলে এক নেতার আওতায় চলে যেতে হবে—এটাও তারা মানতে পারছিল না।

হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথায় প্রথম দিকে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন আর্থিকভাবে দুর্বল। কিন্তু হজরত আবু বকর (রা.) ও হজরত উসমানের (রা.) মতো বড়োলোকরাও মুসলমান হয়ে যাওয়ায় কুরাইশরা একটু উদ্বিগ্ন ছিল। কিছুদিন পর হজরত উমর (রা.) ঈমান গ্রহণ করলেন। তিনি মক্কার প্রচণ্ড সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন এবং একসময় হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রচণ্ড শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কার লোকেরা অনেক বেশি দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়।

হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যতই সমালোচনা বা বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন, প্রথম দশ বছর নবিজির চাচা আবু তালেব তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। যদিও আবু তালেব নিজে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি বলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় পাওয়া যায়। তথাপি তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরম মমতা ও স্নেহ দিয়ে রক্ষা করেছেন। আর তার কথাকে মক্কার লোকেরা গুরুত্বও দিত। হজরত খাদিজা (রা.) যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি ও তার স্বামীকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সহযোগিতা করে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে একই বছর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এই দুইজন শুভাকাক্ষী মারা যান। ফলে শত্রুরা তখন অনেক বেশি বেপরোয়া ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বেশ কিছু ঘটনা পরিক্রমার পর একবার কুরাইশদের প্রধান সাতটি গোত্রের প্রধান ব্যক্তির রাতের আঁধারে মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা করেন। যদিও এই গোত্রগুলোর সবাই হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে উত্তম রূপে চিনত এবং ভালো জানত। তারপরও তারা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সৌভাগ্যবশত তাদের এই পরিকল্পনার কথাটি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ জেনে যান এবং কীভাবে এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তা নিয়ে তার অতি বিশ্বস্ত দুই সাহাবির সাথে পরামর্শ করেন। এই দুই বিশ্বস্ত ব্যক্তির একজন ছিল হজরত আলি ইবনে আবু তালিব (রা.), যিনি ছিলেন বুদ্ধিমান একজন যুবক। এই আলি (রা.) পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মেয়ে ফাতিমা (রা.)-কে বিয়ে করে আল্লাহর রাসূলের জামাই হওয়ার মর্যাদা পান। আর অন্য আরেক বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহচর হজরত আবু বকর (রা.), যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিজ পরিবারের বাইরে থেকে ইসলাম গ্রহণ করা প্রথম ব্যক্তি। হজরত আবু বকর (রা.) পরবর্তী সময়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উপদেষ্টা ও শ্বশুর হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে লোহিত সাগরের উপকূলঘেঁষা শহর ইয়াসরিবের লোকদের যোগাযোগ হয়। ইয়াসরিব (পরে এই শহরটির নামকরণ হয় মদিনা) মক্কা থেকে ৪৫৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। এই শহরের মানুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের তুলনায় কৃষিকাজের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিল। তবে তারাও সে সময় খুব শান্তিতে ছিল না। কারণ, ইয়াসরিবেও অনেকগুলো গোত্র ছিল এবং তারা হরহামেশাই নিজেদের মধ্যে মারামারি আর বিবাদে ব্যস্ত থাকত। ইয়াসরিবের লোকদের প্রত্যাশা ছিল বাইরে থেকে বিশুদ্ধ মনের একজন আগন্তুক এলে, তারা তাকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং এর বিনিময়ে তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে সকল গোত্রের মাঝে বিরাজমান বিবাদগুলো নিরসন করে দিতে পারবেন। একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুখ্যাতি অনেক আগে থেকেই তারা জানত। আর মক্কায়ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যকার বিবাদ ইতঃপূর্বে মুহাম্মাদ ﷺ চমৎকারভাবে সমাধান করেছিলেন। তাই ইয়াসরিবের মানুষেরা মনে করছিল, এই মুহাম্মাদই ﷺ হবেন তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি, যিনি তাদের শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

এরপরও তাদের পক্ষ থেকে অনেকেই মক্কায়ে এসে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখেন এবং তাঁর সহানুভূতিশীল আচরণ দেখে তাঁর প্রতি তাদের আস্থা আরও বেড়ে যায়। ফলে তারা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান এবং আল্লাহর রাসূলকে ﷺ মদিনায় যাওয়ার দাওয়াত দেন। রাসূল ﷺ সেই দাওয়াত কবুলও করেন।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা করে মক্কার অধিপতিরা। সেই রাতেই হজরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকরকে (রা.) সাথে নিয়ে মরুভূমির পথে পাড়ি জমান। আলি (রা.) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূল ﷺ-এর বিছানায় শুয়ে পড়েন, যেন বাইরে থেকে কেউ এসে তাঁকে দেখে মনে করে যে মুহাম্মাদই ﷺ শুয়ে আছেন। আততায়ীরা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করতে এসে না পেয়ে এবং সেই বিছানায় আলিকে (রা.) দেখে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তারা আলির (রা.) বয়স কম দেখে তাকে ছেড়ে দেয় এবং নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে খোঁজার জন্য মরুভূমিতে অনুসন্ধানী দল পাঠায়। সেই রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং হজরত আবু বকর (রা.) মক্কার নিকটেই একটি গুহায় আশ্রয় নেন।

অলৌকিকভাবে সেই গুহার মুখে মাকড়সা জাল ফেলে। রাসূল ﷺ-কে খুঁজতে আসা একটি দল সেই গুহার কাছে আসে ঠিকই; কিন্তু গর্তের মুখে মাকড়সার জাল দেখে তারা মনে করে, অনেক দিন এই গুহায় কেউ ঢোকেনি। এই ভেবে তারা ফিরে যায়। অবশেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর বন্ধু আবু বকরকে (রা.) নিয়ে নিরাপদেই ইয়াসরিবে পৌঁছান।

মক্কা থেকে যারা এভাবে মদিনায় এলেন, তারা সকলেই নিজ বাড়ি ও সম্পত্তি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকেই নিজেদের পরিবারের সদস্য ও আপনজন যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদেরকেও ছেড়ে আসেন। কিন্তু তারপরও তারা নিজ শহর ছেড়ে আসেন। কারণ, ইয়াসরিবে তারা নিরাপদে থাকতে পারবেন আর এখানে তাদের নেতা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে কর্তৃত্ব করার সুযোগও দেওয়া হয়েছিল। তাই জীবনের সম্মান ও মর্যাদাও এখানে তারা বেশি পাবেন।

ইয়াসরিববাসী তাদের কথা রেখেছিল এবং তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিরাজমান বিবাদ মীমাংসা করার ক্ষমতাও দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূলও ﷺ তাঁর দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। তিনি সেখানকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বি ও গোত্রের সাথে কয়েকটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে সক্ষম হন, যেগুলো একত্রভাবে পরবর্তীকালে ‘মদিনা সনদ’ নামে পরিচিতি লাভ করে। ফলে ইয়াসরিবে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি গোত্র তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিল। কারণ, নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর এই ভারসাম্যপূর্ণ চুক্তির কারণে প্রতিটি গোত্র স্বাধীনভাবে তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচারাди মানতে পারত। এর মাধ্যমে প্রতিটি গোত্রের স্বাধীনতা ও সম্মান ছিল। তাই এক গোত্র আরেক গোত্রের ওপর অন্যায়ভাবে চড়াও হতে পারত না। কোনো গোত্রের ভেতরে কোনো সমস্যা হলে নিজেরাই তা সমাধান করতে পারত। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এই চুক্তিটি মদিনাকে আরও সুরক্ষিত করে। চুক্তি অনুযায়ী মদিনা যদি কখনো বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকার হয় তাহলে মুসলমান বা অমুসলমান সবাই মিলে একসঙ্গে এই শহরকে রক্ষা করবে। উল্লেখ্য, মদিনা সনদ বা চার্টার অব মদিনা নামে এই চুক্তিটি পরিচিত হলেও এটাকে বলা যায় মানব ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান।

একইসঙ্গে নবি মুহাম্মাদ ﷺ আরেকটি অনন্য সাধারণ কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে আসা প্রতিটি পরিবারের জন্য ইয়াসরিবের একজন করে স্থায়ী বাসিন্দা নিয়োগ করলেন, যেন তারা নতুন এই মানুষগুলোকে নতুন শহরে স্থিতিশীল হতে এবং নব উদ্যমে জীবন শুরু করতে সাহায্য করতে পারেন। এই সময় থেকেই ইয়াসরিবের মুসলমানদেরকে আনসার বা সাহায্যকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়।

অন্যদিকে, ইয়াসরিবের নামটিও পালটে ফেলা হয়। নতুন করে এর নাম দেওয়া হয় ‘মদিনা’ যার অর্থ ‘শহর’। ‘মদিনাতুন নবি’ বা ‘নবির শহর’ হিসেবে নাম দেওয়া হলেও পরে সংক্ষিপ্তভাবে মদিনা নামটিই বেশি প্রচলন হয়। আর মক্কা ছেড়ে মদিনায় আসার এই বিষয়টিকে অভিহিত করা হয় হিজরত হিসেবে। যখন মুসলমানরা তাদের নিজেদের ক্যালেন্ডার বা দিনপঞ্জিকা তৈরি করে, তখন তারা এই হিজরতের দিন থেকেই দিন গণনা শুরু করে। আরবিতে যাকে বলা হয় হিজরি।

হিজরতের দিনটিকে এতটা গুরুত্ব দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, মুসলমানরা মনে করত এই দিনটি আসলে নতুন একটি ইতিহাস শুরু করার দিন। এটা ইতিহাসের এমন এক মাহেন্দ্রক্ষণ যেখান থেকে তাদের সৌভাগ্য শুরু হয়েছে। এই কারণে মুসলমানরা সময়ের দুটো হিসেব শুরু করে। একটি হলো হিজরতের পূর্বকালীন, আরেকটি হলো হিজরত পরবর্তী।

কোনো কোনো ধর্ম তাদের দিন গণনা শুরু করে তাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠাতার জন্মের দিন থেকে। আবার কোনো কোনো ধর্ম দিন গণনা শুরু করে সেদিন থেকে যেদিন তাদের ধর্ম প্রচারক প্রথমবারের মতো স্বর্গীয় বার্তা পেয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বৌদ্ধ ধর্ম সেদিন থেকেই শুরু হয়, যেদিন সিদ্ধার্থ গৌতম বধি গাছের নিচে বসে প্রথম ধর্মের সন্ধান লাভ করেন। অন্যদিকে, খ্রিষ্টানরা যিশুখ্রিষ্টের জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরাবির্ভাবকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু মুসলমানরা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মদিনকে খুব যে গুরুত্ব দেন, তা নয়। যেমন একজন মুসলমান হিসেবে আমি ভালোমতো জানতামও না যে, কবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। কারণ, শৈশবে যখন আফগানিস্তানে বড়ো হয়েছি, তখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমি সেখানে আলাদা কোনো আয়োজন করতে দেখিনি। মিসরের মতো কিছু দেশ রয়েছে, যারা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মদিনকে একটু বর্ণাঢ্যভাবে পালন করে। তবে যেটাই হোক না কেন, যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিনকে যেমন ওরা ক্রিসমাস ডে হিসেবে পালন করে, এরকম কোনো ‘মুহাম্মাদ মাস’ পালনের বিধান ইসলামে নেই।

যে রাতে কুরআন প্রথম নাজিল হয়, সেটা অবশ্য মুসলমানদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই রাতটি মর্যাদার রাত্রি, নৈতিক শক্তি অর্জনের রাত্রি। এই রাতকে বলা হয় ‘লাইলাতুল কদর’ যা রমজান মাসের শেষ দশকের কোনো বেজোড় রাতে পালন করা হয়। তবে এই ঘটনাটি ঘটেছে মুসলিম হিজরি গণনা শুরু হওয়ারও ১৩ বছর আগে।

একটি জায়গা থেকে আরেকটি জায়গায় চলে যাওয়ার এই ঘটনাটি (হিজরত) কেন এতটা গুরুত্ব পেল? চিন্তা করলে দেখা যায়, মুসলিম ইতিহাসে হিজরতের এই ঘটনাটি খুবই গর্বের ও প্রেরণার। কারণ, এই হিজরতের কারণেই মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচয় লাভ করে। যাকে বলা হয় উম্মাহ। হিজরতের আগে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ নির্দিষ্ট কিছু অনুসারীর নেতা ছিলেন, আর হিজরতের পর তিনি গোটা একটি জাতির নেতা হয়ে গেলেন। পুরো জাতির আইন প্রণয়ন, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সামাজিক বিধিবিধান আরোপের ক্ষেত্রে তাঁর ওপর নির্ভর করত। যারা মদিনায় রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বাধীন জাতির মধ্যে शामिल হতো, তারা তাদের পূর্বাপর নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর সম্পর্কের তুলনায় নতুন এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর সাথে বেশি মজবুত সম্পর্ক বজায় রাখত। কারণ, মদিনা ছিল রাসূল ﷺ-এর শৈশবে দেখা জাহেলিয়াতে ভরপুর মঞ্চার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্র, যা অনেকটা স্বপ্নগাঁথা, একটি অসাধারণ মানবতাবাদী সমাজ প্রকল্প।

এই সামাজিক প্রকল্পটি হিজরতের পর মদিনায় বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি ধর্ম, তবে একইসঙ্গে এর একটি রাজনৈতিক চেহারাও রয়েছে। অবশ্যই ইসলাম আমাদেরকে সঠিক ও সুন্দর পথের কথা বলে। প্রতিটি মুসলমান এই নির্দেশনা মেনে জান্নাতেও যেতে চায়। তবে ইসলাম কখনো একক একজন ব্যক্তির ধার্মিক বা মানবিক উন্নয়নের কথা বলে না। বরং ইসলাম এমন একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করে, যার মাধ্যমে গোটা একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজও প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারে, যদি তারা এই উম্মাহর অংশ হতে পারে এবং যদি তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন ধরনের ইসলামি সামাজিক প্রকল্পে শরিক করতে পারে। কারণ, প্রকৃত বাস্তবতা হলো ইসলাম এমন একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যেখানে কোনো ইয়াতিম পরিত্যক্ত অবস্থায় বড়ো হবে না, কোনো বিধবা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হবে না, কেউ না খেয়ে থাকবে না আর কেউ ভয়ে দিন কাটাতে না।

যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ মদিনার নেতা হয়ে গেলেন, মানুষ তখন দলে দলে তাদের জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে উত্থিত প্রশ্নে জবাব পাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আসতে লাগল। সেটা ছোটো প্রশ্ন হোক, কী বড়ো প্রশ্ন হোক।

যেমন : বাচ্চাদের কীভাবে মানুষ করব? কীভাবে হাত ধোয়া যায়, চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত, চোরের সাথে আমরা কেমন আচরণ করব ইত্যাদি। অন্য সম্প্রদায়ে এসব প্রশ্ন হয়তো বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে করা হতো। ধরা যাক, আইন বিষয়ক প্রশ্ন হলে বিচারকদের কাছে বা আইন প্রণেতাদের কাছে, কিছু প্রশ্ন রাজনীতিবিদদের কাছে, কিছু প্রশ্ন চিকিৎসক আবার কিছু প্রশ্ন শিক্ষকদের কাছে। কিন্তু মদিনা রাষ্ট্রে সকল বিষয়েই প্রশ্ন করা হতো কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে।

মক্কায় থাকাকালে কুরআনের যেসব সূরা নাজিল হয়েছিল, তার ভাষা ছিল অনেকটা এরকম :

‘যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন ভূগর্ভ তার বোঝা বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে, এর কী হলো? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে সে রকমই আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে আবির্ভূত হবে, যেন তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।’ (সূরা যিলযাল)

যদি আপনি মদিনায় নাজিল হওয়া আয়াতগুলোকে দেখেন, তাহলে সেখানেও আপনি একই ধরনের আবেগতাড়িত ও ছন্দময় ভাষা পাবেন। তবে তার পাশাপাশি এমন আয়াতও পাবেন-

‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয়

তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা-পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিস হয় তার মাতা-পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা-পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জানো না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’ (নিসা : ১১)

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এসব সূরাতে বিভিন্ন বিষয়ে আইন বা বিধান প্রদান করা হয়েছে। কারণ, মুসলমানরা এই সময়ে এসে উম্মাহ হিসেবে নানাভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছিল তাই তাদের এই ধরনের নির্দেশনারও প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল।

হিজরতের পর মদিনার সকল বাসিন্দাই ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করছিল। কিন্তু শহরের বড়ো বড়ো ৩টি ইহুদি গোত্র ছিল, যারা কোনোভাবেই ইসলাম গ্রহণে রাজি হচ্ছিল না। একটা সময়ের পরে, তাদের সাথে মুসলমানদের বেশ ব্যবধানও তৈরি হয়। আবার আরবদের মধ্যে যারা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর এসব বিধিবিধানে এবং নবি হিসেবে ক্রমাগত গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, তাদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছিল।

অন্যদিকে, যদিও মুহাম্মাদ ﷺ মক্কা থেকে ৪৫৪ মাইল দূরে গিয়ে বসবাস করছিলেন, তথাপি মক্কার কুরাইশরাও তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র তখনো চালিয়ে যাচ্ছিল। কুরাইশরা তার মাথার জন্য ১০০ উট পুরস্কার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা গোটা মুসলমান জাতিকে নির্মূল করার চেষ্টায় ছিল। মদিনায় যেন ভালোভাবে আক্রমণ করা যায় এবং যেন কোনো অর্থের সংকট না হয়, সে কারণে মক্কার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরও বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, মদিনায় থাকা মুহাজিররা সুযোগ পেলে মক্কার এসব বাণিজ্যিক অভিযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করত।

এভাবে কয়েক দফা চলার পর মক্কার লোকেরা বেশ শক্তি সঞ্চয় করে। তারা সহস্রাধিক সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে, মুসলমানরা তাদের প্রতিরোধে মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে বদরের ময়দানে যুদ্ধে মিলিত হয় এবং যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজিত করে। পবিত্র কুরআন বদরের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বারবার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই যুদ্ধ হলো আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতার উত্তম নিদর্শন। আল্লাহর ওপর যদি কেউ ভরসা করে, তাহলে যেকোনো যুদ্ধে আল্লাহ তার সৈনিকদের বিজয় দান করেন। তাতে শত্রু সংখ্যা যত বেশি হোক না কেন বা অন্য যত প্রতিবন্ধকতাই আসুক না কেন।

বদর যুদ্ধের পূর্বে কিছু বেদুইন চুক্তিতে মক্কার বণিকদের জন্য দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করত। কিন্তু বদরের যুদ্ধের পর তারা পক্ষ বদল করে মুসলমানদের দিকে আসতে থাকে। মদিনায় মুসলমানদের এই ক্রমবর্ধমান সাফল্য প্রতিপক্ষ ইহুদিদের আরও আতঙ্কিত করে তোলে। তিনটি ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায় পূর্বে স্বাক্ষরিত মদিনা চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। তারা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যদিও তাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে এই সম্প্রদায়কে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সবকিছু দেখে কুরাইশরা আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে যায়। অবস্থা এমন হয়ে যাচ্ছিল যে, তারা যতই মুহাম্মাদ ﷺ-কে শেষ করার চেষ্টা করছিল, ততই যেন তারা নিজেরাই আরও বেশি করে অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিল। হিজরতের ৩য় বছরে তারা আরও বড়ো বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। তারা বদরের তুলনায় সৈন্য সংখ্যা ৩ গুণ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ ৩ হাজার সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে, মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৫০ জন। মানে তাদের প্রতি একজনকে তিনজন কুরাইশ কাফেরকে মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু বদরের পর মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। কোনো সংখ্যাধিক্যকেই তারা আর গুরুত্ব দিতে চায়নি। কারণ, তারা বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে আছেন।

ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় যে বড়ো যুদ্ধটি হয়, তার নাম উহুদ। যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসলমানরা প্রায় জিতেই যাচ্ছিল। কিন্তু যখন মক্কার কুরাইশরা পিছু হটছিল, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রকাশ্য একটি নির্দেশকে ভুলে যায়। এতে মুসলিম সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ফলে কুরাইশরা প্রখ্যাত বীর যোদ্ধা খালিদ বিন ওয়ালিদদের নেতৃত্বে আবার মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল মুসলমানদের সেনাপতি হিসেবে অনেকগুলো যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সেই উহুদের যুদ্ধে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও আহত হন। সর্বমোট ৭০ জন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন এবং অনেকেই আহত হন। উম্মাহ টিকে থাকে, তবে উহুদ মুসলমানদের ইতিহাসে আজও একটি বড়ো আকারের ট্রাজেডি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ইসলামের ইতিহাসে যেসব যুদ্ধ হয়েছে, আসলে তা ইতিহাসের অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় বেশ ছোটো আকারের। তবে প্রতিটি যুদ্ধই ইসলামের ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রতিটিরই আলাদা আলাদা তাৎপর্য রয়েছে।

যেমন, বদরের যুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে জাগতিক বিষয়াবলি বা প্রতিবন্ধকতার তুলনায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে কী প্রমাণ হয়েছে? সেখানে আল্লাহর পথের সেনানিরা কেন পরাজিত হলেন?

হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাখ্যামতে, উহুদের যুদ্ধ থেকে আমরা অন্য ধরনের শিক্ষা নিতে পারি। প্রিয় নবির ﷺ মতে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যতটুকু বিপর্যয় দেখেছে, তা হয়েছে শিক্ষা নেওয়ার জন্যই। মুসলমানরা এই পৃথিবীতে যাই করুক না কেন, এমনকী যুদ্ধও যদি করে, তা হতে হবে একটি ন্যায়নিষ্ঠ কারণ থেকে। কিন্তু উহুদের যুদ্ধ চলাকালীন সাময়িকভাবে হলেও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধপণ্য পাওয়ার আশ্রয় এসেছিল। ফলে তারা রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করে ফেলেছিল। সেই কারণেই তারা সে সময়ে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু মুসলমান হওয়ার কারণেই সকল ধরনের আসমানি নেয়ামত তার জন্য বরাদ্দ থাকবেই, তা নয়। বরং এই নেয়ামতটুকুও মুসলমানকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর দেওয়া বিধান পালন করার মধ্য দিয়েই অর্জন করে নিতে হবে। এই শিক্ষাটি মুসলমানদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় হলেও তারা এখান থেকে সরে এসেছে বারবার। তারা সেকারণেই অনেকবার বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বলেও ইতিহাস থেকে জানা যায়। তেরো শতাব্দীতে হোলোকাস্টের পর মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয় সম্প্রদায় যখন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বড়ো একটি অংশ কেড়ে নেয়, তখনো এর প্রয়োজন ছিল। আর ১৮ শতক থেকে শুরু হয়ে আজ অবধি মুসলমানদের ওপর পশ্চিমাদের যে আধিপত্য চলছে, তার মোকাবিলায়ও এই শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম।

যাহোক, উহুদেও যুদ্ধের পর মুসলমানদের ওপর পরবর্তী আঘাত হানার জন্য কুরাইশরা দুই বছর ধরে পরিকল্পনা করে। কুরাইশরা এবার শুধু নিজেরা নয়; বরং আশেপাশের বিভিন্ন জাতি ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী থেকে লোক নিয়ে ১০ হাজার সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী তৈরি করে। সেই সময়ের আলোকে এটা ছিল এক বিশাল বাহিনী। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন জানতে পারলেন যে কুরাইশরা এই বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনার দিকে আসছে; তখন তিনিসহ তাঁর সঙ্গীরা মিলে মদিনা শহরের খোলামুখে অর্থাৎ উত্তর দিকটাতে পরিখা তৈরি করে এক ধরনের প্রতিরক্ষা বৃহৎ নির্মাণ করেন। বাকী তিন দিকে পাহাড় ও খেজুর বাগান থাকায় সেই দিকগুলোতে পরিখা খননের প্রয়োজন হয়নি। কুরাইশরা বিপুল সংখ্যক উট নিয়ে সেই যুদ্ধে এসেছিল কিন্তু তারা সেই পরিখা ভেদ করে সামনে এগোতে পারেনি। তাই তারা মদিনা শহরের চারপাশে অবস্থান নিয়ে এক ধরনের অবরোধ আরোপের মাধ্যমে মদিনাবাসীকে না খাইয়ে মারার ষড়যন্ত্র করে। এই যুদ্ধে পরিখা নির্মাণ করে কৌশল অবলম্বন করায় একে ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

এই অবরোধের পেছনে আসলে ভিন্ন একটা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। উহুদের যুদ্ধের পর মদিনার ইসলামবিরোধী আরেকটি ইহুদি গোত্রও কুরাইশদের সাথে যোগসাজশে মদিনার বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই প্রথম ইহুদি গোত্রের মতো তাদেরও বিচার হয় এবং পরবর্তী সময়ে মদিনা থেকে বের করে দেওয়া হয়। তৃতীয় ইহুদি গোত্রটি ছিল বনু কুরাইজা। তারা প্রথম দুই ইহুদি গোত্রের পরিণতি দেখে সতর্ক হয় এবং মদিনা চুক্তির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে সে যাত্রায় রক্ষা পায়। খন্দকের যুদ্ধের সময় এসে এই গোত্রের নেতারা গোপনে কুরাইশদের সঙ্গে আঁতাত করে। তাদের গোপন সমঝোতা অনুযায়ী কুরাইশরা যখন সম্মুখ দিক থেকে মুসলমানদের

ওপর আক্রমণ করবে, তখন বনু কুরাইজাও পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে। এভাবে দুইদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের বিপর্যস্ত করে ফেলার পরিকল্পনা আঁটে তারা।

কিন্তু পরিখার কারণে কুরাইশরা সম্মুখদিক থেকে কোনো আক্রমণ চালাতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের গোপন সহযোগী বনু কুরাইজাও হতাশ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, কুরাইশদের এই বাহিনীটি যেহেতু বিভিন্ন গোত্রের মানুষের সম্মেলন ছিল, তারাও ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা মূলত এসেছিল যুদ্ধ করতে কিন্তু যুদ্ধ না করে এভাবে দিনের পর দিন বসে থাকতে থাকতে তারাও হতবিস্বল হয়ে পড়ে। এরপর এক রাত্রিতে বালুঝড় শুরু হলে তারা সম্পূর্ণরূপে কুপোকাত হয়ে যায়। ফলে তারা অবরোধ উঠিয়ে নিজেরাই কেটে পড়ে আর কুরাইশরাও ব্যর্থ মন নিয়ে মক্কায় ফিরে যায়।

তবে পুরো এই ঘটনাটি নেতিবাচক ফল দেওয়ায় সবচেয়ে বিপদে পড়ে যায় বনু কুরাইজা গোত্র। এই ঘটনার পর তাদের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায় এবং তাদের সকল সহযোগীও তাদের ছেড়ে চলে যায়। মদিনা সনদ লজ্জনের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়। বিচারকের আসনে ছিলেন তাদেরই আস্থাভাজন এবং মদিনায় একসময়ে তাদের সহযোগী একজন বিচক্ষণ ও সর্বজনমান্য ব্যক্তি। বিচারে বনু কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণ হয় এবং পুরুষদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আর নারী ও শিশুদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই বিচারের রায় কার্যকর করা হয়।

এই বিচারিক প্রক্রিয়াটি গোটা আরব জাহানে একটা ভিন্ন ধরনের বার্তা পৌঁছে দেয়। মদিনায় আইনের শাসন কতটা শক্তিশালী সেই সম্পর্কেও সবাই ধারণা পায়। যদিও কুরাইশরা খন্দকের যুদ্ধে বিশাল পরিমাণ সেনা সমাবেত করেও বিজয়ী হতে পারেনি; বরং এক ধরনের হতাশাজনক পরাজয়বরণ করে মক্কায় ফিরে এসেছিল কিন্তু যেভাবে তারা নাস্তানাবুদ হলো, তা তৎকালীন বিশ্বে অপরাজেয় মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে।

পৃথিবীর অন্য সকলে তখন বুঝতে পারে, মুসলমানরা কেবল আর অন্য দশটা জাতিগোষ্ঠীর মতো সাধারণ কোনো জাতিগোষ্ঠী নয়; বরং তারা চিন্তাচেতনা ও কর্মে অনেকটাই ভিন্ন। মুসলমানরা অন্য সকলের চেয়ে ভিন্ন ধরনের জীবনযাপন করে। তারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আচারাди পালন করে। আর তাদের এমন একজন ভিন্ন প্রকৃতির নেতা ছিল, যার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে গেলে তিনি ওহির মাধ্যমে জেনে কিছুক্ষণ পর খুবই কার্যকর একটি সমাধান দিয়ে দিতেন। আর সেই কারণেই মুসলমানরা কোনো কিছুতেই ভয় পেত না। এমনকী তাদের সংখ্যার তুলনায় তিন গুণ বেশি বড়ো সেনাবাহিনীকেও তারা অবলীলায় হারিয়ে দিতে পারত।

কোথা থেকে সেই আসমানি বার্তাগুলো আসত?

বাইরের জগতে সেই শক্তিমান আল্লাহকে নিয়ে অনেক রকম ভাবনা ছিল। অনেকেই মনে করত, মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে তাদেরই মতো কোনো শক্তিশালী দেবতার সন্ধান আছে। কিন্তু মুসলমানরা

পরে সেই বিভ্রান্তি দূর করে এবং বিশ্ববাসীকে জানায়, তারা কোনো দেব-দেবীর উপাসনা করে না। তারা ইবাদত করে সেই রাব্বুল আলামিনের যিনি সারা বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক। মুসলমানদের এই বিশ্বজগতের মালিক কথাটিও বেশ আলোচিত হয়। অমুসলমানরা ভাবে যদি আদৌ সে রকম কোনো মারুদ থেকে থাকে, তাহলে পৃথিবীতে মুহাম্মাদই ﷺ একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে সেই সর্বশক্তিমানের যোগাযোগ আছে।

কারণ, দেখা গেল ক্রমশ মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করার মতো ব্যক্তি বা মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করার মতো বাহিনী কমে আসছে। কেউ আর মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার সাহস পাচ্ছে না। খন্দকের যুদ্ধের পর জোয়ারের বেগে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। অনেকেই ভাবতে পারে, এত বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে আসলে ব্যক্তি স্বার্থে; বিজয়ীদের সাথে থাকার লোভে। কিন্তু মুসলমানরা এটা বিশ্বাস করত না। তারা বিশ্বাস করত, মানুষ প্রতিনিয়ত ইসলামকে বুঝতে পারছে বলেই মুসলমান হচ্ছে। তা ছাড়া হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহচর্য ও ধর্মীয় অনুশাসন মানাও অদ্ভুত সুন্দর এক অভিজ্ঞতা। তাই নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে আসলে তাঁর জাদুময় সংস্পর্শেই অনেকেই সত্যের পথে ফিরে আসত।

হজরত মুহাম্মাদ ﷺ কখনোই নিজে দাবি করেননি যে, তাঁর এমন কোনো ক্ষমতা আছে যার মাধ্যমে তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন বা পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারেন কিংবা অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারেন। তিনি বরাবরই একটা দাবি করেছেন, তা হলো তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকেই কথা বলছেন। এমনও নয় যে, তাঁর মুখ থেকে যাই নিঃসৃত হতো, তার সবটাই সরাসরি আল্লাহর বাণী। তিনি নিজে থেকেও দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কিছু কথা বলতেন। তবে তিনি ওহির জ্ঞান ছাড়া নিজে থেকে শরিয়াহ সম্পর্কিত কোনো কথা বলতেন না। তাহলে কখন তিনি ওহির বাণী বলতেন আর কখনোইবা তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বলতেন?

ওই সময় এটা নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। আজকের দিনে এসে মুসলমানরা কুরআন পড়া বা শোনার সুন্দর একটি পন্থা বের করেছে, যার নাম কিরাত। মানুষ যেভাবে সাধারণত কথা বলে, কিরাত ঠিক তেমন কিছু নয়। কুরআনের তেলাওয়াত সুরেলা; কিন্তু এটা আবার কোনো গানও নয়। এর শব্দ বা কথাগুলো এমন ব্যক্তির হৃদয়েও আবেগ সৃষ্টি করে, যিনি হয়তো এর কোনো শব্দের অর্থই বোঝেননি। যারা কিরাত করেন, তাদের প্রত্যেকের পড়ার ধরন আলাদা থাকলেও তাদের সকলেরই মৌলিকত্ব সাদৃশ্যপূর্ণ। যখন মুহাম্মাদ ﷺ সাহাবিদের সামনে কুরআনের নতুন নাজিল হওয়া আয়াত পাঠ করতেন, হয়তো এমনই কোনো আবেগতড়িত ও জাদুকরী কণ্ঠে তা বলতেন। সেই কারণেই যখন কেউ হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছ থেকে কুরআনের তেলাওয়াত শুনত, তারা যে শুধু সাদামাটাভাবে শুনত তা নয়; বরং শোনার সময় তারা এক ধরনের আলোড়নও অনুভব করত। সেজন্যই কোনো ভাষার কুরআনের অনুবাদকেই প্রকৃত কুরআন হিসেবে মুসলমানরা স্বীকৃতি দেয় না। তারা মনে করে কুরআন অবিভাজ্য। এর প্রতিটি শব্দ, শব্দের অর্থ, এমনকী এর প্রতিটি

উচ্চারণের তাৎপর্য রয়েছে। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি দিয়ে প্রকৃত কুরআনকে বুঝা যাবে না। মুসলমানরা আরও বিশ্বাস করে, এর একটি শব্দও হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিজের নয়। বরং তাঁর ওপর কুরআন নাজিল হয়েছে আর সেই কারণেই দলে দলে মানুষ কুরআনের অমিয় বাণী শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আরেকটি বিষয়ও ছিল, যা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে এবং হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের বাণী বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তা হলো, তৎকালীন বিশ্বের এই জায়গাটি বরাবরই খুব অশান্ত ছিল। তখনকার সময়টা এমন ছিল যে, লোকালয় মানেই হলো অনেকগুলো গোত্রের সমন্বয়, যাদের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ বা নিধন করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করত আবার কিছু দিন পর হয়তো নতুন আরেক সম্প্রদায় নেতৃত্বে চলে আসত। বিশেষ করে আরব অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিষয়টা যেন স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল।

যখনই হজরত মুহাম্মাদ ﷺ নেতৃত্বে আসলেন, তিনি মানুষকে বললেন এরকম হানাহানি বন্ধ করে শান্তিতে বসবাস করার জন্য। আর বিশ্বাসীরা তা পালনও করল। মুসলমানরা এরপরও লড়াই করেছে, আর তা অধিকাংশ সময়েই আত্মরক্ষা করার জন্যই। তারা একে অন্যের সাথে অহেতুক যুদ্ধে লিপ্ত হতো না। তাদের টিকে থাকার ক্ষেত্রে যেসব বহিঃশত্রুরা হুমকি ছিল, তারা শুধু তাদের সাথেই শক্তি ব্যয় করত। যারা ইসলাম গ্রহণ করে উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হতো, তারা সাথে সাথেই প্রবেশ করত ‘দার-আল-ইসলামে’ যার মানে ‘আত্মসমর্পণের জগতে।’ এরপর বিভিন্ন আচার-আচরণ ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট সমর্পিত করে দিতেন। ‘দার-আল-ইসলাম’-কে শান্তির জগৎও বলা হতো। আর ইসলামের শান্তিময় গণ্ডির বাইরে যেই জগৎটি ছিল, তাকে বলা হতো ‘দার-আল-হারব’ বা ‘যুদ্ধের জগৎ।’

ইসলাম গ্রহণ করা মানে শুধু মুসলমান হওয়া নয়; বরং একইসঙ্গে একটি অনুপ্রেরণামূলক সামাজিক প্রকল্পেও যুক্ত হওয়াকে বোঝানো হতো। এই সামাজিক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আপনার উম্মাহকে টিকিয়ে রাখতে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। কারণ, এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ যারা গ্রহণ করবে তাদেরকে অনেক ধরনের শত্রুর মোকাবিলাও করতে হবে। জিহাদ মানেই সহিংসতা নয়। তবে জিহাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সশস্ত্র যুদ্ধ রয়েছে, যাকে কিতালও বলা হয়। জিহাদের ভালো অর্থ হতে পারে চেষ্টা, সংগ্রাম। পশ্চিমা সামাজিক ন্যায়বিচারের নামে যা করছে, এক অর্থে জিহাদ বলতে সেই সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেই বোঝায়। আর এই ধরনের সংগ্রাম হয় খুবই মহৎ। এই সংগ্রামটি চালানো হয় একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আর সেই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যদি কখনো সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হয়, তাতেও কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়।

পরবর্তী দুই বছরে আরব উপত্যকায় থাকা সকল নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনুগত্য মেনে নেয়। তারা ইসলাম গ্রহণ করে উম্মাহর অংশ হয়ে যায়। এক রাতে হজরত

মুহাম্মাদ ﷺ স্বপ্ন দেখেন যে তিনি মক্কায় ফিরে গেছেন এবং সেখানে সবাই আল্লাহর ইবাদত করছেন। সকালে তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে মক্কার উদ্দেশে যাত্রার নিয়ত করেন। তিনি প্রায় ১৪০০ মুসলমান নিয়ে ৪৫০ মাইল দূরের মক্কার পথে রওয়ানা দেন। সেই সময়ে অনেকগুলো সহিংস ঘটনা ঘটলেও তিনি ও তাঁর সাহাবিরা এই যাত্রাটি করেছিলেন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়। তাদেরকে কোনো যুদ্ধেও পড়তে হয়নি। তবে মক্কার দরজা তাদের জন্য খোলা হয়নি। কুরাইশরা তাদের সেখানে যেতে অনুমোদন দেয়নি। তবে কুরাইশদের নেতারা শহরের বাইরে এসে মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে। ইতিহাসে যাকে হুদায়বিয়ার সন্ধি হিসেবে অভিহিত করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী মুসলমানরা এই বছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু তারা পরের বছর মক্কায় প্রবেশ করতে এবং সকল ধর্মীয় কার্যক্রম পালন করতে পারবে। কুরাইশরা এই চুক্তির সময়েই বুঝে গিয়েছিল, তাদের দিন শেষ।

সপ্তম হিজরিতে মুসলমানরা পুনরায় মক্কায় আসে এবং কোনো রকম সহিংসতা ছাড়াই কাবা প্রদক্ষিণ করে। পরের বছরই মুসলমানরা মক্কা জয় করে নেন। মক্কা জয় করেই প্রিয় নবি ﷺ কাবার ভেতরে রাখা সকল মূর্তি ধ্বংস করেন এবং কাবাকে বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মীয় স্থান হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপরও কুরাইশদের কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা কেউ হালে পানি পায়নি। ক্রমান্বয়ে সকল আরব উপজাতি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নেতৃত্বে একীভূত হয় এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গোটা আরব অঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

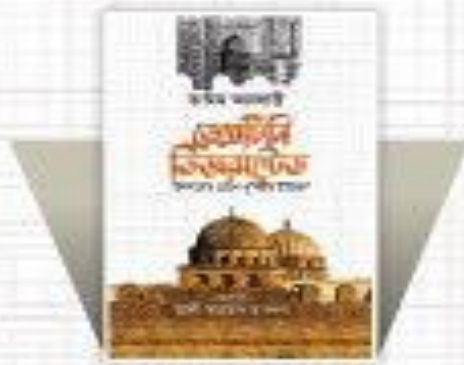
দশম হিজরিতে (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে) আল্লাহর রাসূল ﷺ হজের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে বের হয়ে এক সমাবেশে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। সেই ভাষণে তিনি প্রত্যেক মুসলমানের জীবন ও সম্পত্তিকে অপরের জন্য আমানত ও পবিত্র সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি প্রতিটি মানুষ এমনকী দাসদাসীকেও মানুষ হিসেবে পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন। তিনি বলেন, পুরুষের যেমন নারীদের ওপর অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনি পুরুষের ওপরও নারীদের অধিকার রয়েছে। তিনি আরও ঘোষণা করেন, মুসলমানদের মধ্যে সবাই সমান, কেউ ছোটো বা বড়ো নয়। বড়ো যদি কাউকে হতেই হয়, তাহলে তিনি হবেন তার তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহভীতির কারণে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবতার জন্য তিনি সর্বশেষ রাসূল ﷺ-এর পরে আর কোনো নবি আসবে না এবং কারও মাধ্যমে আসমানি ওহিও আর অবতীর্ণ হবে না।

এরপর তিনি মদিনায় ফিরে আসেন। মদিনায় ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় তিনি তাঁর সকল স্ত্রী ও ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সকলের কাছ থেকেই বিদায় নেন। সবশেষে তিনি আসেন তাঁর স্ত্রী হজরত আয়েশার (রা.) কাছে, যিনি আবার নবিজির ঘনিষ্ঠ বন্ধু হজরত আবু বকরের (রা.) মেয়ে। বিবি আয়েশার ঘরে থাকা অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন।

কেউ একজন প্রিয় নবির ﷺ ইন্তেকালের খবরটি পেয়েই তা উদ্বিগ্ন হয়ে থাকা জনগণকে জানিয়ে দেয়। এই খবরটি লোকমুখে শুনেই রাসূল ﷺ-এর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সাহাবি হজরত উমর (রা.) প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি ঘোষণা দেন, যে তার কাছে এসে বলবে নবি মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছেন, তিনি তাকে আক্রমণ করে বসবেন। মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন, এটা অসম্ভব।

তারপর নবিজির ﷺ সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ সহচর হজরত আবু বকর (রা.) বিষয়টা সত্য কি না তা জানার চেষ্টা করেন। এক মুহূর্ত পরেই তিনি তার মেয়ের (বিবি আয়েশা) ঘর থেকে বেরিয়ে সকলকে জানান, ‘হে মুসলমানরা, তোমরা যারা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপাসনা করো, তারা জেনে রাখো মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করো, তারা জেনে রাখো আল্লাহ অমর ও চিরস্থায়ী।

আবু বকরের (রা.) এই তেজদীপ্ত ঘোষণা উমরের (রা.) উত্তেজনা অনেকটাই প্রশমিত করে দেয়। তাঁর মনে হচ্ছিল, তার পায়ের নিচ থেকে মাটি ক্রমশই সরে যাচ্ছে। তিনি প্রচণ্ড লজ্জিতও হন এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারণ, তিনি বুঝতে পারেন খবরটা সত্য, আল্লাহর নবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ সত্যি সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।



‘Destiny Disrupted: History Of The World Through Islamic Eyes’ বইটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক দিন সর্বাধিক বিক্রিত বই হিসেবে পরিচিত ছিল। ২০১০ সালে বইটি মর্থান ক্যালিফোর্নিয়া বুক অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। মূলত পশ্চিমাদের জানা ইতিহাসের বাইরে এই বইটিতে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের সাল ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১৪শত বছরের ঘটনাবলীকে এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পশ্চিমা বিকৃত ইতিহাস নয়, বরং ঘটনার শেকড়ে গিয়ে সত্যিকারের ইতিহাসকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বইটিকে ইসলামি ইতিহাসের এনসাইক্লোপিডিয়া বললেও অত্যুক্তি হবে না। বইটির পাতায় পাতায় আছে তথ্য, আছে শিহরণ জাগানো গল্প, আছে ঘটনার সামনের ও পেছনের প্রেক্ষাপটের চমৎকার পর্যালোচনা। পাঠকেরা বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন নিঃসন্দেহে, তবে তার চেয়ে বড় কথা পাঠকবৃন্দ এই বইটি পড়ে আরও পরিণত হবেন, তাদের জ্ঞানের ভান্ডার আরও সমৃদ্ধ হবে। ইসলামের চোখে তারা ইতিহাসকে নতুন করে আবিষ্কার করবেন।



গার্ডিয়ান

পাঠ্য পুস্তক
৩৪, বাহুবাজার, ঢাকা-১০০০
www.guardianpubs.com

ডেস্টিনি ডিসরাপ্টেড

ISBN 978-984-8254-11-0



9 789848 254110